কাজের কথা
শ্রীভীষ্মপদ ঘোষ

কাজের
কথা
শ্রীভীমানন্দ ঘোষ
আশুতোষ
লাইব্রেরী

উৎসর্গ-পত্র

পরমারাধ্য পূজনীয়

৺সারদাপ্রসাদ ঘোষ

পিতাঠাকুর মহাশয়ের

পুণ্য-স্মৃতির

উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

কত জিনিস আমরা নিত্য ব্যবহার করি, কিন্তু তাহার "কথা" অতি অল্পই আমরা জানি। অলীক গল্প ও উপন্যাস পাঠের নেশা আমাদিগকে এত পাইয়া বসিয়াছে যে, ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশের ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা বাঙ্গলাদেশের ছেলেমেয়েদের জ্ঞান সাধারণ বিষয়ে অতি অল্প। বাঙ্গালীকে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে হইলে বাস্তব জীবনের নানা "কথা" তাহাকে জানিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কত দিন কত "কথা" ছাত্রগণকে শুনাইয়াছি। এতদিন যাহা বিদ্যালয়ের শ্রেণীর ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, বৃহত্তর বঙ্গের ছেলে-মেয়েদের নিকট আজ তাহাই উপস্থিত করিলাম। এই সকল "কথা" পড়িয়া তাহারা শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

শুভ নববর্ষ,

সন ১৩৪৫

শ্রীভীমাপদ ঘোষ

সূচী

তৈল বাহির করিবার জন্য যন্ত্র সাহায্যে মাটি খোঁড়া হইতেছে।

তৈলের বড় খনির দৃশ্য
(পাশাপাশি অনেকগুলি তৈল-বাহী কূপ দেখা যাইতেছে) [পৃঃ ৭২

কাজের কথা

চা

আজকাল অনেকেই চা পান করেন। পল্লীতে পল্লীতে—মুদীর দোকানে পর্য্যন্ত চা পাওয়া যায়। চা একরকম গাছের পাতা হইতে তৈয়ারী করা হয়। তোমরা বোধ হয় ইহার সম্বন্ধে এইটুকু ছাড়া আর বিশেষ কিছুই জান না।

আমাদের দেশে দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়, আসামে ও শ্রীহট্টে অনেক চা-বাগান আছে। যাঁহারা দার্জ্জিলিং গিয়াছেন তাঁহারা রেল হইতে অনেক সময় চায়ের বাগান দেখিয়াছেন, কিন্তু কোনও বাগানে গিয়া কারখানায় কিরূপে চা প্রস্তুত হইতেছে, অনেকেই তাহা দেখেন নাই। চা ভারতের

ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। কাজেই চা-বাগানের গাছগুলি ছোট ছোট ঝোপের মত হইয়া থাকে। গাছ ছাঁটিয়া দিবার কয়েক সপ্তাহ পরেই নূতন পাতা গজায় ও কুলিরা ছোট ছোট পাতাগুলি সংগ্রহ করে। পালাক্রমে তাহারা বাগানের এক-এক অংশে এক-এক দিন কাজ করে। প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত বাগানে কাজ করিয়া তাহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে কারখানায় পাতা ওজন দেয়। কারণ, সাধারণতঃ তাহারা ওজন হিসাবে মজুরী পায়। কাঁচা পাতা তুলিবার জন্য প্রতি পাউণ্ডে ৴১০, ৴১৫ বা /০ হিসাবে মজুরী দেওয়া হয়। ইহাতেই প্রত্যেক কুলী দৈনিক বার আনা হইতে দেড় টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করে। পাতা তুলিবার কাজ সকল সময়ে সমানভাবে চলে না। অন্য সময়ে গাছের গোড়া পরিষ্কার করা, উহাতে মাটি দেওয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করা ইত্যাদি কত প্রকার কাজ তাহারা করে। এই সকল দৈনিক কাজ সাধারণতঃ ঠিকা মজুরীতে করান হয়।

চা গাছ না ছাঁটিলে দশ-পনেরো ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়। অনেক বাগানে বীজের জন্য কতকগুলি গাছ ছাঁটা হয় না। সেগুলিতে ঈষৎ হরিদ্রাভ সাদা সাদা ফুল হয় এবং তাহা হইতে প্রতি বৎসর ফল ও বীজ পাওয়া যায়।

পাতা কারখানায় আনা হইলে, উহা শুষ্ক করিতে দেওয়া হয়। এইজন্য প্রত্যেক কারখানায় বেশ ভাল বন্দোবস্ত

আছে। সাধারণতঃ লোহার জালের বড় বড় ডালা থাক থাক করিয়া র‍্যাকের মত সাজান থাকে। পাতাগুলি এই সকল ডালায় বিছাইয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় পাতা শুষ্ক করিবার ঘর দোতালায়—কখনও বা ইঞ্জিন-ঘরের উপরে থাকে। চা-বাগানগুলি সাধারণতঃ পাহাড়ের ধারে অবস্থিত। সেখানে বৃষ্টিও যত, শীতও তত। কাজেই পাতা শুষ্ক করিবার জন্য অনেক কারখানায় গরম হাওয়া দিবার, ফ্যান বা বৈদ্যুতিক পাখা চালাইবার ইত্যাদি নানাপ্রকারের কৃত্রিম বন্দোবস্ত আছে। নীচ হইতে উপরে পাতা তোলা, এক ঘর হইতে অন্য ঘরে পাতা লইয়া যাওয়া ইত্যাদি কাজ অনেক কারখানায় কলের সাহায্যে হয়।

দেড় বা দুই দিন পরে পাতাগুলি একটু শুষ্ক হইলে জড়াইবার জন্য রোলিং মেসিনে দেওয়া হয়। শুষ্ক পাতার রং তখনও সবুজ থাকে ও তাহাতে রস থাকে। এই পাতা কলের সাহায্যে বা কুলীর সাহায্যে রোলিং মেসিন ঘরে বিছান হয়। তাহার পর এক একবারে কতকগুলি করিয়া পাতা মেসিনে দেওয়া হয়। রোলিং মেসিনে একটি গোল পাত্র থাকে। তাহাতে পাতাগুলি দেওয়া হয়। উপরে হাতলওয়ালা একটি চাক্‌তী থাকে। কল চলিতে থাকিলে এই চাক্‌তী পাতার উপর অনবরত ঘুরিতে থাকে। পাতার উপর আবশ্যকমত ঈষৎ চাপও ইহার দ্বারা দেওয়া হয়।

নীচের পাত্রটিও অনেক সময় ঘুরিতে থাকে। কুড়ি হইতে চল্লিশ মিনিট রোল করা হইলে পাতাগুলি পাকাইয়া অনেকটা ছোট হইয়া যায় ও ইহার রংও পরিবর্ত্তিত হয়।
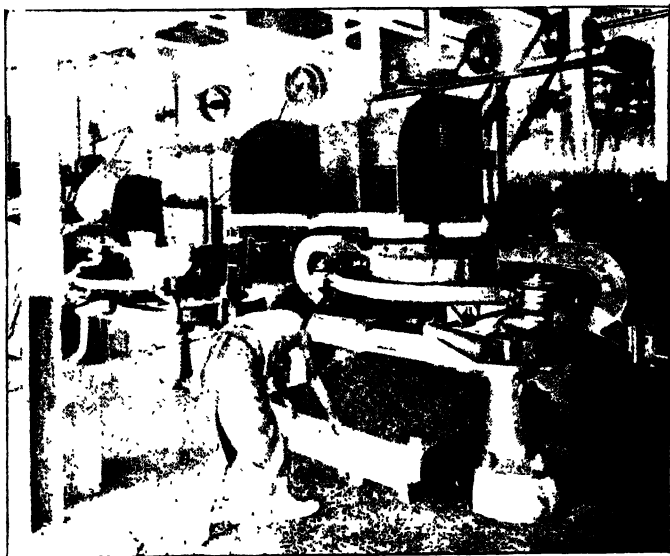
চায়ের পাতা জড়াইবার কল বা রোলিং মেসিন

তখন তারের চালুনে পাতাগুলি ফেলা হয়, ছোটগুলি বাছিয়া লইয়া বড়গুলি আবার রোল করা হয়। এইরূপে কতকগুলি পাতা দুই-তিন বার রোল করা হয়। একটি

কারখানায় আবশ্যকমত দুই-তিন বা ততোধিক রোলিং মেসিন থাকে।

পাতা রোল করা হইলেই উহা মাতাইবার ঘরে লইয়া গিয়া বিছাইয়া দেওয়া হয়। ইংরাজীতে ইহাকে Fermenting room বলে। এই ঘর সাধারণতঃ ইঞ্জিন ঘর হইতে একটু দূরে থাকে। ৭৮° ডিগ্রী ফারনহিট হইতে ৮২° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপে পাতাগুলি ৩।৪ ঘণ্টা বিছাইয়া রাখা হয়। এই ঘর বেশ ঠাণ্ডা ও এই মাতানর উপর চায়ের ভাল-মন্দ অনেকটা নির্ভর করে। এইখানে চা-পাতা পাংশুবর্ণ—অনেকটা লালচে হয় ও ইহা হইতে সুগন্ধ বাহির হইতে থাকে।

তারপর এই পাতা প্রকাণ্ড জ্বলন্ত চুল্লীর উপর দিয়া সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করা হয়। এই সকল চুল্লীকে ইংরাজীতে furnace বলে। ইহাতেও থাকে থাকে পাতা দিবার অনেকগুলি ডালা থাকে। আজকাল অনেক কারখানায় এক-ধারে পাতা দেওয়া হয় আর অপরধারে শুষ্ক পাতা আসিয়া জমা হয়। সমস্তই কলের সাহায্যে হয়। এই চুল্লীর উত্তাপ আবশ্যকমত ২০০° হইতে ২৬০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত থাকে ; কাজেই চুল্লীর উত্তাপ ঠিক রাখা বেশ দক্ষতার সহিত করিতে হয়। বলা বাহুল্য চুল্লীর সংখ্যাও কারখানার আয়তনের উপর নির্ভর করে।

এইরূপে শুষ্ক হইয়া আসিলে কলের সাহায্যে বা কুলীর

দ্বারা চালিয়া চায়ের পাতা গুণানুসারে নানাপ্রকার ভাগ করা হয়। কোনও কোনও কারখানায় ৩।৪ ভাগ করা হয়। কোথাও আবার ৮।১০ রকমের ভাগ করা হয়। ইহাও আবার চা-পরীক্ষকদের পরামর্শ মত করা হয়। বড় বড় কারখানায় চা পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী বা Tea Tester আছেন। তাঁহারা চা প্রস্তুত করিতেছেন, কাপে ঢালিতেছেন, বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ দেখিয়া চায়ের কদর বা শ্রেণী ঠিক করিয়া দিতেছেন।

ইহার পর বাক্সবন্দী করিয়া চা দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হয়। কোন কোন কারখানায় প্যাকিং পর্য্যন্ত কলের সাহায্যে হয়। প্রত্যেক বাক্সে উহার ওজন, বাগানের নাম ও কি রকমের চা উহাতে আছে তাহা লেখা থাকে। সকল স্থানের চা সমান মূল্যে বিক্রীত হয় না। আমাদের দেশে দার্জ্জিলিংএর চা-ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বাগানের কল সাধারণতঃ কাষ্ঠ বা কয়লার সাহায্যে চালান হয়। কোন কোন কারখানায় জল-স্রোতের সাহায্যে কল চালান হয়। কারখানার মালিকগণ অনেক সময় নদীর গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া খাল কাটিয়া কারখানার মধ্যে লইয়া যান। নদীতে স্রোতের জোর না থাকিলে কখনও কখনও বড় ও উচ্চ বাঁধ দিয়া কৃত্রিম জলপ্রপাত প্রস্তুত করা হয় এবং এই জলের বেগ বা শক্তি দ্বারা কল চালান হয়। এমন অনেক

বাগান আছে যেখানে নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে ঝরণা বা জলাশয় নাই। কোন কোন বাগানে ২০।২৫ মাইল দূর হইতে পাইপ ও পাম্পের সাহায্যে জল সরবরাহ করা হয়।

এক একটি বাগানের আয়তন দুই-তিন ক্রোশ জুড়িয়া হয়। ছোট ছোট বাগানও আছে। পাঁচ বা ছয় শত হইতে আরম্ভ

চা-বাগানে কুলীরা কাজ করিতেছে

করিয়া পাঁচ সাত হাজার কুলী এক-একটি বাগানে কাজ করে। ইহাদের জন্য কারখানার মালিকগণ ছোট ছোট কুঁড়েঘর প্রস্তুত করিয়া দেন। চিকিৎসার জন্য প্রায় প্রত্যেক বাগানেই

ডাক্তারখানা আছে। ২০।২৫টি বাগানের মালিকগণ মিলিয়া অনেক সময় এক একজন ভাল ইউরোপীয় ডাক্তার রাখেন। বাগানের কাহারও কঠিন রোগ হইলে তাঁহারা চিকিৎসা করেন। এই সকল বাগানে সাধারণতঃ জ্বর, কালাজ্বর ও আমাশয় রোগ বড় বেশী হয়। কুলীরা পীড়িত হইলে বাগানের কাজ বন্ধ থাকে। সেইজন্য তাহারা যাহাতে সুস্থ দেহে থাকে ইহার প্রতি প্রত্যেক ম্যানেজারেরই খুব দৃষ্টি থাকে। তবে কোন কোন বাগানে কুলীদের থাকিবার স্থান ভাল নহে ও তাহাদিগের কাজ-কর্ম্মের সামান্য ত্রুটী হইলে তাহাদিগের প্রতি অযথা অত্যাচার করা হয়।

কুলীদের নিজেদেরও অনেক দোষ আছে। ইহারা মিতব্যয়ী ও চরিত্রবান হইলে যথেষ্ট সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু মদেই ইহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। শিক্ষার প্রসার না হইলে এই সকল কু-অভ্যাস তাহারা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কিন্তু অধিকাংশ বাগানে কুলীদের বা তাহাদিগের ছেলেমেয়েদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত একেবারেই নাই।

নানা কারণে চা পান করার অভ্যাস দেশের মধ্যে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভারতবর্ষে চা প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া চা পান করা ভাল ইহা যেন কেহ মনে না করেন। চা পান করিলে শরীর কিছুক্ষণের জন্য উত্তপ্ত হয় ও সাময়িক স্ফূর্ত্তি আসে; কিন্তু ইহাতে ক্ষুধানাশ করে, শরীর রুক্ষ করে, পেটের অসুখ

ও অনিদ্রা আনিয়া দেয়। চা শীতপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে উপকারী ও নিত্য আবশ্যক। ভারতবর্ষের মত গরম দেশে চা পান করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। ইহাতে ভাল না হইয়া বরং মন্দই বেশী হইতেছে। সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে এদেশের লোকের পক্ষে চা পান ত্যাগ করাই ভাল।

চিনি

চিনি আমাদের একটি নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিস। অনেক গাছের কাণ্ড, ফল, মূল প্রভৃতিতে অল্পবিস্তর চিনি আছে; তবে ইক্ষুদণ্ডে চিনির ভাগ বেশী বলিয়া সাধারণতঃ ইহা হইতেই চিনি তৈয়ারী হয়। বীটমূল হইতেও অনেক চিনি প্রস্তুত হয়।

এদেশে সকলেই ইক্ষুদণ্ড বা আখ দেখিয়াছেন। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে ইহা একপ্রকার ঘাস মাত্র। ইক্ষু গাছ পুষ্ট হইলে ইহা কাটিয়া ফেলা হয়। তখন উহার ডগা পুঁতিয়া আবার চারা প্রস্তুত করা হয়। আমাদের দেশে প্রথমে সার মাটী প্রভৃতি দিয়া জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করে। তাহার পর চৈত্র বা বৈশাখের প্রথমভাগে ইক্ষুর চারা প্রায় এক হাত অন্তর অন্তর সারি বাঁধিয়া রোপণ করে। এদেশে শ্বেতী, বোম্বাই, কাজ্‌লে, কোয়েম্বাটুর প্রভৃতি অনেক রকমের ইক্ষু আছে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের চেষ্টায় কয়েকবৎসর হইতে জাভা, টানা বোম্বাই, কোয়েম্বাটুর প্রভৃতি ইক্ষু চাষের প্রচলন হইয়াছে। জাভা ইক্ষু একবার লাগাইলে তাহা হইতে পর পর দুই-তিন বৎসর ইক্ষু উৎপন্ন হয়। এই ইক্ষু কাটিয়া

লইলে গোড়া হইতে আবার চারা বাহির হইয়া ঝাড় বাঁধে। কোয়েম্বাটুর বা মাদ্রাজী ইক্ষু বড় হইলে উহা না বাঁধিয়া দিলেও চলে। এইরূপ কোন কোন প্রকারের ইক্ষু শৃগাল বা অন্যান্য জন্তুতে খাইতে পারে না ও ইহাতে বেশী রস হয় বলিয়া কৃষকেরা ইহা খুব পছন্দ করিতেছে। কোন কোন রকম ইক্ষু দশ-পনেরো মাস পরে কাটা হয় ও লম্বায় দশ হইতে বিশ ফুট পর্য্যন্ত হয়।

নাতিশীতোষ্ণ লবণাক্ত স্থানসমূহ ইক্ষু-চাষের পক্ষে উপযোগী। ফসল ভাল পাইতে হইলে রৌদ্র ও বৃষ্টির আবশ্যক হয়। যে সকল ভূমি জলে ডুবিয়া যায়, তাহাতে ভাল ইক্ষু জন্মে না। অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে সেচ দিবার ভাল বন্দোবস্ত থাকিলে ইক্ষু ভাল হয়। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। তবে কোন কোন প্রকার ইক্ষু এত বেশী ও ঘন হইয়া জন্মায় যে, সমস্ত জমি ইক্ষুদণ্ডে ভরিয়া যায়।

ইক্ষু ও চিনির কথা ভারতবর্ষের লোকে অতি প্রাচীনকাল হইতে জানে, কারণ অথর্ব্ব বেদে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইক্ষু প্রথমে একমাত্র বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইত। তাহার পর ক্রমশঃ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং দক্ষিণ এশিয়ার নানা দেশে ইক্ষু-চাষের প্রচলন হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তদানীন্তন চীন-সম্রাট্ চিনি-শিল্প শিখিবার জন্য মগধ রাজ্যে কয়েকজন লোক প্রেরণ করেন। তাঁহারা দেশে ফিরিয়া

গিয়া তথায় চিনি প্রস্তুত করেন। পারস্য ও আরব দেশের অধিবাসিগণ ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে ইক্ষু-চাষের প্রচলন করেন। স্পেনদেশবাসিগণ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিবার পর নিগ্রোকুলী দ্বারা সে দেশে ইক্ষুর চাষ করেন। ক্রমশঃ কিউবা, জাভা, মরিসাস্, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে ইক্ষুর চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে শর্করা বা **Sugar** ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম আমদানী হয়।

বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে দেশীয় প্রথায় অল্প পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হয় এবং কোনও কোনও স্থানে চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। অনেক সময় দেশী চিনি বাজারে কাশীর চিনি বলিয়া বিক্রীত হয়। উত্তর বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কোনও কোনও জেলায় খুব বেশী পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে ২৫ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হইত। এখন সেখানে প্রায় ৪৪ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারত সরকার চিনি-শিল্প রক্ষা করিবার জন্য ও ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ১১ লক্ষ টন চিনি আবশ্যক হয়, কিন্তু এখন উৎপন্ন হয় প্রায় ১২ লক্ষ টন চিনি। কাজেই ভারতের চিনি এখন বিদেশে চালান দিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

মজঃফরপুর, চম্পারণ প্রভৃতি জেলায় পূর্ব্বে অনেকস্থানে নীলের চাষ হইত। এখন সেই সকল স্থানে ইক্ষুর চাষ

নিগ্রোকুলীরা ইক্ষুক্ষেত্রে কাজ করিতেছে

হইতেছে। আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে সে দেশে বেড়াইতে গেলে দুই তিন মাইল ব্যাপী সারি সারি ইক্ষুক্ষেত্র দেখিতে

পাওয়া যায়। এইরূপে বঙ্গদেশে পাট ও অন্যান্য ফসলের পরিবর্ত্তে অনেক জমিতে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ করা যাইতে পারে।

ইক্ষু পাকিলে বা পুষ্ট হইলে আমাদের দেশের এক-একটি গ্রামের বা পাড়ার কৃষকেরা সমবেত হইয়া আখমাড়াই কল ভাড়া করে এবং ইক্ষু হইতে রস ও গুড় তৈয়ার করে; কিন্তু যে সকল জেলায় প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হয় তথায় বড় বড় কারখানায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষেই এইরূপ পঞ্চাশ-ষাটটি চিনির কারখানা বা কল আছে। ইহাতে প্রতিবৎসর প্রায় সাড়ে তিন কোটী মণ চিনি প্রস্তুত হয়।

যেখানে চিনির কারখানা আছে, সেখানে কৃষকেরা ইক্ষু কাটিয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশনে লইয়া যায়। আবার কারখানার কর্ম্মচারীদের নিকট ঐ ইক্ষু ওজনদরে বিক্রয় করে। কয়েক বৎসর হইতে ইক্ষু ।/০ হইতে ।/১০ মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। তাহার পর ঐ ইক্ষু কারখানায় চালান হয়। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে চিনির কলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এত ইক্ষু রেলযোগে চালান হয় যে, ঐ সময় ইক্ষু লইয়া যাইবার জন্য রেলকোম্পানী প্রত্যহ স্পেশাল গাড়ী চালান। অধিকাংশ কারখানায় বৎসরের তিন-চারি মাস মাত্র কাজ হয়; কিন্তু সমস্ত বৎসর ধরিয়া কাজ

হয় ভারতবর্ষে এইরূপ কারখানাও তের-চৌদ্দটি আছে। যখন ইক্ষু পাওয়া যায় না তখন এই সকল কারখানায় গুড় হইতে
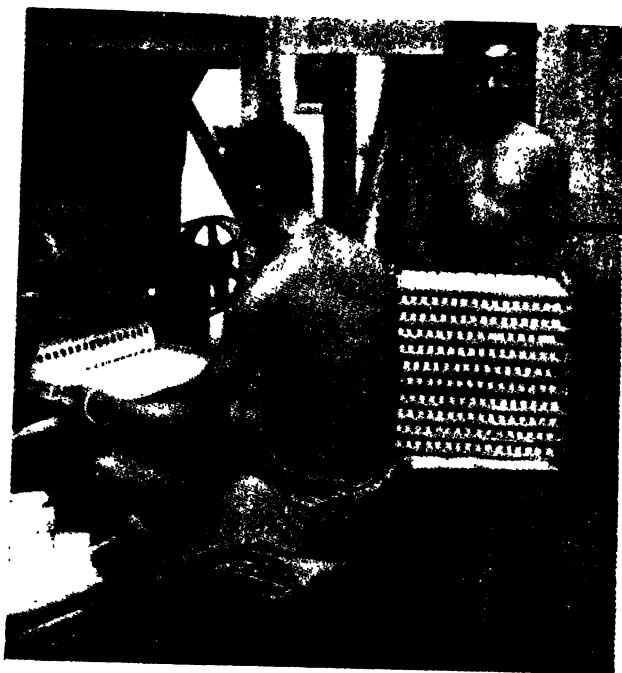
চিনির কল

চিনি প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ আড়াই বা তিন মণ গুড়ে একমণ চিনি প্রস্তুত হয়।

ইক্ষুদণ্ডগুলি কারখানায় পঁহুছিলে আখমাড়াই কলে

উহাদিগকে পিষিয়া রস বাহির করা হয়। ভাল ইক্ষুদণ্ডে শতকরা কুড়িভাগ পর্য্যন্ত শর্করা থাকে; কিন্তু আমাদের দেশে দশ বা সাড়ে-দশভাগের বেশী চিনি পাওয়া যায় না। জাভা, মরিসাস্ প্রভৃতি দেশের ইক্ষুতে যেরূপ রস হয়, এদেশে সেরূপ হয় না। জাভা দ্বীপে ইক্ষুক্ষেত্রে জোয়ানের খৈল সাররূপে ব্যবহার করিয়া ইক্ষুর ফলন ও রস বাড়ান হইয়াছে। সেখানে ইক্ষুর মণ ৵১০, সুতরাং তথায় ভারতবর্ষ অপেক্ষা অল্প খরচে চিনি প্রস্তুত হয়। উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য ও সার প্রবর্ত্তন করিলে এদেশের ইক্ষুর উন্নতি হইতে পারে। পল্লীগ্রামে যে সকল কল দেখিতে পাওয়া যায়, উহা গরুতে বা মানুষে টানে; উহাতে অনেক রস নষ্ট হইয়া যায়। কৃষকেরা বড় বড় কড়াইয়ে রস জ্বাল দেয়; কাজেই অনেক রস না জমিলে রস জ্বাল দিতে পারে না। সেইজন্য প্রায়ই অম্লরস উৎপন্ন হইয়া রসের মিষ্টত্ব অনেক কমিয়া যায়। চিনির কারখানায় সেরূপ হইবার উপায় নাই। সেখানে উন্নত প্রণালীর কল দ্বারা বাষ্প বা বৈদ্যুতিক শক্তি সহযোগে কাজ করা হয়। রস সঙ্গে সঙ্গে জ্বাল দিয়া তাহা হইতে সিরাপ ও চিনি প্রস্তুত হয়। জ্বাল দিবার সময় রসে কিছু চূণ ফেলিয়া দিয়া রস পরিষ্কৃত করা হয়। এই রস গাঢ় হইয়া সিরাপের মত হইলে তাহা ঠাণ্ডা করিতে দেওয়া হয়। উহাকে অনেক সময় 'রাব' বলে। এ সময়ে রসে দানা বাঁধিয়া চিনি প্রস্তুত

হয়। ইহাই বাজারের এক নম্বরের চিনি। চিনি প্রস্তুত হইলে যে রস উপরে জমা থাকে ও যাহা দানা বাঁধে না তাহাকে 'মাৎ' বলে। রসের পাত্রের কোনও ছিদ্র দ্বারা মাৎ বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই মাৎ হইতেও পুনরায় কিছু চিনি পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে গুড় প্রস্তুত করে তাহাও অনেক সময় দানা বাঁধিয়া বালির মত হয়।

কারখানায় প্রথমে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহা আবার অনেক প্রকারে পরিষ্কৃত হয়। কখনও কখনও দানাদার চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য ত্রিকোণ বা চৌকোণ ছাঁচে সিরাপ ঢালা হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সিরাপের অপকৃষ্ট অংশকে মাৎগুড় বা চিটাগুড় বলে। তামাক প্রস্তুত করিতে ও অন্যান্য অনেক কার্য্যে চিটাগুড় লাগে। মহীশূর অঞ্চলের ইঞ্জিনিয়ারগণ চিটাগুড়, চূণ ও ইটের খোয়া মিশাইয়া পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন। আমাদের দেশের অনেক রাজমিস্ত্রী পাকা ঘরের ছাদ প্রস্তুত করিবার সময় চিটাগুড় ব্যবহার করে। এসব ছাড়া ইহা হইতে সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে এবং ইহা সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই দেশের লোকে তাহা তেমন ব্যবহার করে না বলিয়া অনেক কারখানায় ইহা ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ইক্ষু মাড়া হইলে যে 'ছিবড়া' বা 'খোয়া' পড়িয়া থাকে

তাহাতে গুড় মাখাইয়া লইলে গবাদির উত্তম খাদ্য হয়। কৃষকেরা অনেক সময় ইহা জ্বালানী রূপে ব্যবহার করে। ইক্ষুর পাতা ও ডগা প্রভৃতি গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ইহার কোনও অংশই নষ্ট হয় না।

পৃথিবীর উৎপন্ন চিনির এক-চতুর্থাংশ একমাত্র কিউবা দ্বীপে উৎপন্ন হয়। ইক্ষু-চাষের পক্ষে এই স্থানের জলবায়ু বিশেষ উপযোগী। এই দ্বীপকে অনেক সময় 'ইক্ষুর রাণী' বলা হয়।

কিন্তু ইক্ষুর কথা মনে হইলেই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কথা আগে মনে হয়। এখানে পূর্ব্বে নিগ্রোদের দ্বারা ইক্ষুর চাষ হইত। তাহাদিগের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ অল্পদিনের মধ্যেই ইক্ষুক্ষেত্রের বহু শ্বেতকায় মালিক লক্ষপতি হইয়া পড়েন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আইন দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে 'দাস-ব্যবসায়' উঠিয়া গেলেও ইংরাজ জাতি বহুদিন ধরিয়া 'দাস' শ্রমিকদিগের প্রস্তুত চিনি ব্যবহার করিয়া পরোক্ষভাবে দাস-ব্যবসায়ের সহায়তা করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রায় সকল দেশের ইক্ষুক্ষেত্রের শ্রমিকদিগের অবস্থাই চিনির বলদের মত! তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ক্ষেত্রে ইক্ষু জন্মাইবে, কিন্তু ফসলের একটুকরাও তাহাদের প্রাপ্য নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে ক্ষেত্র-স্বামীর। যদি দৈবাৎ কেহ লোভবশতঃ ফসলের কোনও অংশ গ্রহণ করে ও মালিকেরা তাহা জানিতে পারে, তাহা

হইলে তাহাকে বেত্রাঘাত করা হয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে তাহাকে ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড প্রদেশ ইক্ষু-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ কোন কোনও দ্বীপের অধিবাসীদিগকে লইয়া ঐদেশে প্রথমে ইক্ষুর চাষ করা হয়। তাহার পর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্টের আদেশে সমস্ত কালা আদমীকে ঐদেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য এই যে কালা আদমীকে অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিতে দিবে না ও ইক্ষুক্ষেত্রের লাভ ষোল আনাই শ্বেতকায় অধিবাসীরা ভোগ করিবেন। ইহার ফলে ইক্ষু-চাষের উপযোগী বহুলক্ষ বিঘা জমি সেদেশে এখনও পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই। কি করিয়া অল্প জমিতে বেশী ফসল উৎপন্ন করা যায়, ইহার প্রতিই তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

আফ্রিকার কেনিয়া দেশে কয়েকবৎসর হইতে ইক্ষুর চাষ হইতেছে। বহু ভারতীয় শ্রমিক ঐদেশে পেটের দায়ে শ্বেতকায় মালিকদের ইক্ষুক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। কখনও কখনও শুনা যায় যে, শ্বেতকায় মালিকগণ তাহাদিগের উপর অত্যাচার করেন। আজকাল এইরূপ অত্যাচার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়।

ইক্ষুদণ্ড সম্বন্ধে নানা দেশে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর

গল্প প্রচলিত আছে। তাহার একটি বলিয়া ইহার কথা শেষ করিব। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ সামোয়া, ফিজি প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীদের বিশ্বাস যে এই ইক্ষুদণ্ড হইতে আদি মানবের জন্ম। সৃষ্টির প্রথমে এক ইক্ষুদণ্ড হইতে দুইধারে দুই 'ফেক্‌ড়া' বা ডাল বাহির হয়। ক্রমে উহার প্রত্যেকটি 'পাব' বা অংশ ফাটিয়া যায় ও উহার একটি হইতে স্ত্রী ও অপরটি হইতে পুরুষের উদ্ভব হয়। ভগবান জানেন—এই গল্প সত্য কিনা; কিন্তু সকল মানুষের ব্যবহার যদি চিনি বা ইক্ষুদণ্ডের মত মিষ্ট হইত, তাহা হইলে পৃথিবী কতই না সুন্দর হইত!

ইহার পর আমরা সংক্ষেপে বীট-চিনির কথা বলিব। বীটগাছ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। আমরা সাধারণতঃ যে বীট দেখি তাহার বর্ণ লাল; কিন্তু যে বীট হইতে বেশীর ভাগ চিনি প্রস্তুত হয়, তাহা দেখিতে সাদা—কতকটা মূলার মত। বীটের মূলগুলি বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া ও পরিষ্কৃত করিয়া কলের সাহায্যে চাপ দিয়া উহা হইতে রস বাহির করা হয়। রস বাহির করিবার দুই-তিন প্রকার প্রথা আছে। বীটের রসও ইক্ষুরসের মত জ্বাল দিয়া চিনি প্রস্তুত হয়। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, ডেন্‌মার্ক, ইংল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে বীট-চিনি প্রস্তুত হয়। সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন চিনির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চিনি বীট হইতে পাওয়া যায়। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর বীট-চিনি ভারতীয় বাজার

ছাইয়া ফেলিয়াছিল। বিদেশে বীট-চিনির কাট্‌তি অধিক করিবার জন্য জার্ম্মান্ গবর্ণমেণ্ট চিনির মূল্যের কিছু অংশ কারখানার মালিকদিগকে দিতেন। ইহার ফলে জার্ম্মাণীতে

বীট-মূল

যে দরে চিনি বিক্রয় হইত, ভারতে তাহা অপেক্ষা সস্তা দরে চিনি পাওয়া যাইত। ইংরাজীতে ইহাকে **Bounty fed**

sugar বলে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শ্বেতকায় জাতিদের ব্যবসাবুদ্ধি কত প্রখর।

আমাদের দেশে শীতকালে খেজুরগাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে রস পাওয়া যায়। ঐ রস হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। যশোহর ও ফরিদপুর জেলার কোন কোন স্থানে খেজুরের রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। ঐ চিনির স্বাদে ও গন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। গ্রীষ্মকালে তালগাছের মোচা হইতে রস পাওয়া যায়। উহা হইতে কখনও কখনও চিনি বা মিছরী প্রস্তুত হয়। সর্দ্দি-কাশিতে তালমিছরী ব্যবহার করিতে কবিরাজেরা উপদেশ দেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক লোক খেজুর বা তালের রস মাতাইয়া নেশার জন্য তাহা পান করে। চলতি কথায় ইহাকে 'তাড়ি' বলে। তাড়ি-খোরেরাও মাতালের মত নানা প্রকার অন্যায় কার্য্য করে।

উত্তর আমেরিকায় মেপল বৃক্ষের রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। চেষ্টা করিলে নাতিশীতোষ্ণ দেশসমূহে মেপল বৃক্ষ লাগান যাইতে পারে। আঙ্গুর, কিস্‌মিস্‌, পীচ, আপেল প্রভৃতি মিষ্ট ফল হইতে এবং মধু ও দুগ্ধ হইতে আবশ্যক হইলে চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। মেক্সিকো দেশে ভুট্টার রস হইতে এবং সিসিলিতে মান্না নামক এক প্রকার গাছের রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়।

চিনি সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য বিষয়ের কথা বলিয়া এই

খেজুরগাছ

প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অনেকে 'স্যাকারিনের' নাম

শুনিয়া থাকিবেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। সাধারণ চিনি অপেক্ষা ইহা ২২০ গুণ বেশী মিষ্ট। বহুমূত্র রোগে ডাক্তারেরা অনেক সময় এই চিনি ব্যবহারের উপদেশ দেন। এই চিনি আল্‌কাত্‌রা হইতে প্রস্তুত হয়। আল্‌কাত্‌রা আবার কয়লা হইতে পাওয়া যায়। আল্‌কাত্‌রা হইতে 'স্যাকারিন' ছাড়া ৭০০।৮০০ রকমের সুন্দর সুন্দর রঙ্, সুগন্ধি দ্রব্য, ঔষধ প্রভৃতি পাওয়া যায়। অন্য একটি প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

কোকো

চা-এর মত কোকো পান করার অভ্যাসও আজকাল বড়লোকদিগের মধ্যে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেক পূর্ব্বে আমেরিকায় ইহার প্রচলন হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে মেক্সিকো দেশের সম্রাট্‌ মঞ্জিমার পরিবারবর্গের জন্য প্রত্যহ পঞ্চাশ কলসী কোকো আবশ্যক হইত! ইহা ছাড়া তাঁহার পরিষদ ও ভৃত্যাদির জন্য আরও দুই হাজার কলসী নিত্য খরচ হইত!! শুধু পানীয় রূপেই নহে, মিষ্ট ও মসলাযোগে কোকো হইতে প্রস্তুত 'চকোলেট' রাজপরিবারবর্গের প্রিয় খাদ্য ছিল! সুতরাং তাঁহারা যে পুরাদস্তুর 'কোকো-খোর' ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

চা ভারতে জন্মায়, কিন্তু কোকো বিষুবরেখার নিকট-বর্ত্তী স্থানসমূহ ব্যতীত অন্য কোথাও জন্মায় না। কোকোগাছ অনেক প্রকারের, তবে সব প্রকারের গাছই দেখিতে অনেকটা আপেলগাছের মত। ইহার নরম কচি কচি পাতাগুলি দেখিতে প্রথমে ঈষৎ হল্‌দে ও লালাভ হয়, পরে ইহা সবুজবর্ণ ধারণ করে। পাতাগুলি লম্বায় তের-চৌদ্দ ইঞ্চি হয়। সমুদ্রতল

কোকোগাছ

হইতে ৬০০ ফুটের বেশী উচ্চ স্থানে ইহা আদৌ জন্মায় না। কোকো-চাষের পক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ—যেখানে প্রচুর বারিপাত হয়,—সেইরূপ স্থান ভাল। লঙ্কা দ্বীপ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রেজিল, ইউকেডার ও পশ্চিম আফ্রিকায় ইহার চাষ হয়।

এই সকল স্থানে প্রথমে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া মাটি উত্তমরূপে চাষ করা হয়। তারপর ফাঁক ফাঁক করিয়া কোকোর বীজ পুঁতিয়া দেওয়া হয়। কোকোর ছোট ছোট চারাগুলি বড় কোমল, রৌদ্রের তেজ সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য কোকো-ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় ছায়ার জন্য অন্যান্য ফসল লাগান হয়। গাছগুলি তিন বৎসরের পুরাতন হইলে ইহার কাণ্ড ও শাখায় ফুল ধরে। ফুলগুলি আবার সামান্য ঝড়, বৃষ্টি বা প্রখর রৌদ্র হইলে নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল বিপদ্-আপদ্ কাটাইয়া যে সকল ফুল টিকিয়া থাকে, তাহা হইতে দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা লাল, নীল, হল্‌দে বা সবুজ রঙের ফল পাওয়া যায়। ফলগুলি পুষ্ট হইতে তিন-চারি মাস লাগে ও সেগুলি ছোট ছোট কাঁঠালের মত বৃক্ষে ঝুলিতে থাকে। এক একটি কোকো-ফলের সাদা শাঁসের মধ্যে ৭০।৪২টি লাল বীজ থাকে।

প্রথমে ফলগুলি পাড়িয়া বাগানেই বীজ বাহির করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়। কোনও কোনও স্থানে বীজ শুষ্ক

করিবার কাজ কলের সাহায্যে করা হয়। এই সময় বীজগুলির রঙ্ কালো হইয়া যায়। এই কালো কালো
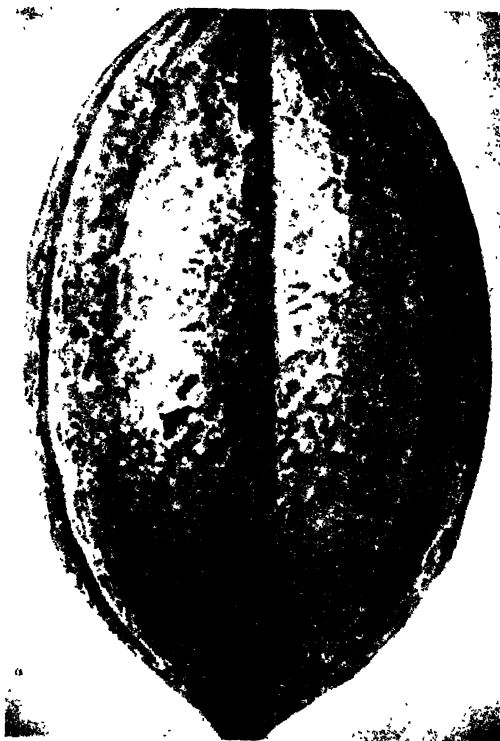
কোকো-ফল

বীজগুলি কারখানায় লইয়া গিয়া ভাজিয়া ফেলা হয়,

কোকোগাছ হইতে ফল সংগ্রহ করা হইতেছে

তারপর এই বীজগুলির শাঁস রোলারের সাহায্যে পিষিয়া ফেলা হয়। এই শাঁসে তৈলাক্ত পদার্থের পরিমাণ খুব বেশী, কাজেই রোলারের চাপে ইহা কালো তরল পদার্থরূপে পরিণত হয়। ঠাণ্ডা হইয়া এই তরল পদার্থ জমিয়া গেলে পুনরায় চাপ দিয়া ইহার তৈলাক্ত পদার্থ সমূহ বাহির করিয়া ফেলা হয়। পরে ইহা শুষ্ক ও পরিষ্কার করিয়া চূর্ণ করিলে কোকো-চূর্ণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে কোকো নামক পানীয় প্রস্তুত হয়। কোকো-ফলের আদত শাঁস ও শাঁসচূর্ণের সহিত মসলা ও মিষ্ট সহযোগে 'চকোলেট' প্রস্তুত হয়। ইহা সকল দেশের বিশেষতঃ ইউরোপীয় বালকবালিকাদের প্রিয় খাদ্য।

রবার

মোটরগাড়ীর চাকায়—রবার, ফুটবলের ব্লাডারে—রবার, জুতার তলায়—রবার, চিকিৎসকের ও বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রে—রবার! এই রকম কত জিনিসে যে রবারের ব্যবহার হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দুইশত বা তিনশত বৎসর পূর্ব্বে অনেক দেশের লোকেই ইহার ব্যবহার জানিত না।

সুপ্রসিদ্ধ আবিষ্কারক কলম্বাস হেইটি দ্বীপে গিয়া দেখিতে পান যে, সে-দেশের বালকেরা যে সকল বল লইয়া খেলা করিতেছে তাহা খুব লাফায়। অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিলেন, সেই সকল বল একপ্রকার বৃক্ষের আঠা দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

ইহার পর ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে লাকন্ডামিন নামক এক ফরাসী ভদ্রলোক বহুদিন বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে রবারবৃক্ষ ও ইহার আঠা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। রবারবৃক্ষের আঠা জমাট করিয়া পেন্সিলের দাগ মুছিয়া ফেলা বা 'রব' (rub) করা হয় বলিয়া ইংরাজীতে ইহাকে রবার (rubber)

বলা হয়। ডাক্তার প্রিষ্টলী যখন রবারের এই গুণের কথা প্রচার করেন, তখন এক ইঞ্চি রবারের চাক্‌তী পাঁচ-ছয় টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত।

ক্রমশঃ লোকে রবারের অন্যান্য গুণের কথা জানিতে পারে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে চার্লস্‌ ম্যাকিণ্টস্‌ প্রথমে রবারের বর্ষাতি বা 'ওয়াটার প্রুফ' পোষাক তৈয়ার করেন। সেইজন্য বর্ষাতিকে এখনও 'ম্যাকিণ্টস্‌' বলা হয়। ক্রমশঃ রবার হইতে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, এমন কি খেলনা পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে থাকে।

খাঁটি রবার গ্রীষ্মকালে নরম ও চট্‌চটে থাকে, কিন্তু শীতকালে শক্ত ও ভঙ্গুর হয়। বৈজ্ঞানিকগণ রবারের এই দোষ দূর করিবার জন্য গবেষণা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে জানা গেল যে, গলিত রবারের সঙ্গে কিছু গন্ধক মিশাইয়া দিলে উহার চট্‌চটে ভাব নষ্ট হয় ও উহা সকল ঋতুতে সমান শক্ত থাকে। গ্রীসদেশের অগ্নিদেবতার নাম ভল্‌কান্‌। আগুন দিয়া রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশান হয় বলিয়া ইহাকে ভল্‌কানাইজড্‌ রবার (Vulcanized rubber) বলা হয়। গন্ধক মিশাইলে রবারের বর্ণ কালো হয় এবং উহা এমন শক্ত হয় যে মালবাহী মোটরগাড়ীর চাকায় পর্য্যন্ত লাগান যায়।

শতাধিক বৃক্ষ হইতে রবার পাওয়া যায়। এখন নানা-

দেশে রবারের চাষ হইতেছে। পূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকায় আমেজন নদীর উপত্যকায় ও আফ্রিকার কঙ্গোদেশে বেশী রবার পাওয়া যাইত।

এখনও ব্রেজিলদেশে তাপাজস্ ও মাদিয়েরা নদীর মধ্য-বর্ত্তী অরণ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রবার পাওয়া যায়। বিলাতের বিখ্যাত কিউ উদ্যানের অধ্যক্ষ সার জোসেফ হুকার এই স্থান হইতে রবারের বীজ সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনও কোনও স্থানে রবারবৃক্ষের চাষ করিবার সঙ্কল্প করেন। সেই সময়ে ভারতের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট মার্কুইস্ অফ সালিস্বারিও তাঁহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার জেম্স্ কলিন্স্ ব্রেজিল দেশ হইতে কয়েকশত রবারবৃক্ষের বীজ সংগ্রহ করেন। এই বীজ হইতে বারোটি মাত্র চারাগাছ কিউ উদ্যানে জন্মায়। তাহার মধ্যে ছয়টি কলিকাতায় আসে; কিন্তু একে একে সবগুলি চারাই নষ্ট হইয়া যায়।

পুনরায় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে রবারবৃক্ষের বীজ-সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। তখন মিষ্টার উইক্হ্যামের উপর এই বীজ-সংগ্রহের ভার পড়ে। ব্রেজিলদেশের প্যারা নামক বন্দর হইতে রবার রপ্তানী হয়। এই জন্য অনেক সময় ঐ দেশের রবারকে প্যারা রবার বলা হয়। মিষ্টার উইক্হ্যাম ব্রেজিলে গিয়া রবার-চাষ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তখন হেভিয়া

নামক রবারবৃক্ষের বীজ পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু কিরূপে ইহার বীজ সংগ্রহ করিয়া অবিকৃত অবস্থায় বিলাতে পাঠাইবেন এই চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে এই সময়ে আমেজন নদীতে 'আমেজন' নামক একটি জাহাজ আসে। মিষ্টার উইক্‌হ্যামের সহিত একদিন ইহার কাপ্তেনের আলাপ হয়। কিছুদিন পরে মিষ্টার উইক্‌হ্যাম সংবাদ পাইলেন যে, আমেজন জাহাজের নাবিকদিগের সহিত কাপ্তেনের মনোমালিন্য হওয়ায় তাহারা জাহাজটি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং উহা একরূপ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

এই সংবাদ পাইবামাত্র মিষ্টার উইক্‌হ্যাম ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে জাহাজটি ভাড়া করিয়া ফেলিলেন, তারপর বহু দেশীয় কুলীর সাহায্যে রবারের বীজ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যথেষ্ট পরিমাণে বীজ সংগ্রহ করিয়া তিনি আমেজন ও তাপাজস্ নদীর সঙ্গমস্থলে জাহাজে আরোহণ করিলেন। অনুকূল বায়ু পাওয়ায় জাহাজ শীঘ্র প্যারা বন্দরে পঁহুছিল। সেখানকার ইংরেজ কন্‌সালের চেষ্টায় পোর্ত্তুগীজ গবর্ণমেণ্টের নিকট শীঘ্র ছাড়পত্র পাওয়া গেল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে সাত হাজার বীজ লইয়া 'আমেজন' জাহাজ লিভারপুল বন্দরে পঁহুছিল। বীজগুলি তৎক্ষণাৎ কিউ উদ্যানে পাঠাইয়া দিয়া চারা প্রস্তুত করা হইল।

রবারবৃক্ষের ত্বকে দাগ কাটা হইতেছে

এক পক্ষ পরে কিউ উদ্যানে সারি সারি রবারবৃক্ষের চারা দেখিয়া সকলেই উৎফুল্ল হইলেন।

কতকগুলি চারা লঙ্কা দ্বীপ ও মালয় দ্বীপে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই সময় হইতে এই সকল দেশে রবারের চাষ বাড়িতে লাগিল। আজকাল আসাম ও ব্রহ্মদেশে রবারের চাষ হইতেছে। যে সকল স্থান গ্রীষ্মপ্রধান, সমস্ত বৎসর বেশ বৃষ্টি হয় অথচ জমি স্যাৎস্যেতে থাকে না, সেই সকল স্থান রবার-চাষের উপযোগী।

প্রথমে মাটি চাষ করিয়া উহা ভালরূপে চূর্ণ ও প্রস্তুত করা হইলে দশ-পনেরো হাত অন্তর সারি সারি রবারের চারা বা বীজ পুঁতিয়া দেওয়া হয়। গাছ ঘন হইলে উহা মোটা হয় না। সেইজন্য দুইটি গাছের মধ্যে অনেকটা জায়গা ফাঁক থাকে।

গাছ চারি-পাঁচ বৎসরের হইলে উহার কাণ্ডে দাগ কাটিয়া আঠা বাহির করা হয়। দাগগুলি খুব গভীর হইলে গাছের ক্ষতি হয়, তাই দাগ কাটিবার সময় অল্প অল্প করিয়া ছিলিয়া দেওয়া উচিত। ইংরেজীতে ইহাকে ট্যাপ (Tap) করা বলে। আমাদের দেশে শিউলীরা এইরূপে খেজুরগাছের রস বাহির করে। তবে তাহারা এক বৎসরে অনেকগুলি দাগ না কাটিয়া একস্থানে চওড়া করিয়া ছিলিয়া দেয়। রবারবৃক্ষের ত্বকও ঐ ভাবে ছেলা হইলে দাগ-কাটা স্থানের নীচে একটি পাত্র রাখিয়া

দেওয়া হয়। পার্শ্ববর্ত্তী দাগগুলি দিয়া মধ্যবর্ত্তী দাগে আঠা পড়ে ও উহা ক্রমশঃ গড়াইয়া পাত্রে জমা হয়। প্রত্যহ
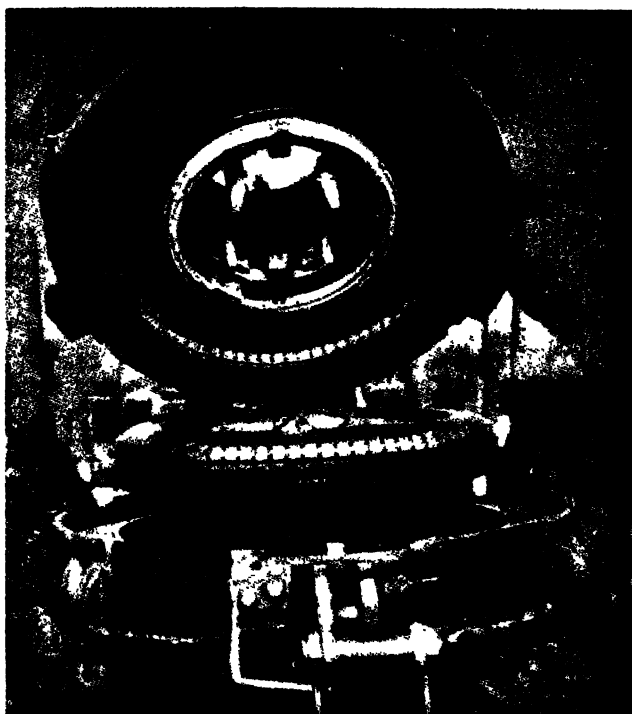
রবার দ্বারা মোটরগাড়ীর টায়ার প্রস্তুত হইতেছে

শিউলীরা গাড়ী করিয়া বড় বড় পাত্র লইয়া বাগানে যায় ও উহাতে আঠা সংগ্রহ করে। আঠা ঢালিয়া লইয়া

তাহারা দাগগুলি সামান্যরূপে ছিলিয়া দেয়। একজন লোকের জিম্মায় তিনশত গাছ থাকে। তাহারা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করে।

দৈনিক সমস্ত আঠা কারখানায় আনা হইলে তাহা বড় বড় ট্রে বা থালায় ঢালা হয় ও তাহাতে এসেটিক এসিড্ দিয়া বারো ঘণ্টা রাখিয়া দেওয়া হয়। তখন রস বা আঠা দেখিতে অনেকটা মাখনের মত হইয়া যায়। তাহার পর রোলার দিয়া চাপ দিয়া উহা হইতে জল বাহির করিয়া ফেলা হয়। এই সময় উহা কিছু শক্ত থাকে ও টানিলে বড় হয়। ইহার পর নারিকেল-ছোবড়ার ধূম দিয়া ইহা শুষ্ক করা হয়। এইজন্য সাধারণতঃ শুষ্ক রবার দেখিতে কালো। বিনা ধূমেও রবার শুষ্ক করা যায়, ইহাকে 'ক্রেপ রবার' বলে।

প্রথমেই রবারের ব্যবহারের কথা কিছু কিছু বলা হইয়াছে। ক্রমশঃ নূতন নূতন কার্য্যে রবারের ব্যবহার হইতেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গোলমাল ও শব্দ কমাইবার জন্য ঘরের মেঝেয় রবার দেওয়া হইতেছে। কালে হয়ত ফুটপাথে, এমন কি রাস্তায় পর্য্যন্ত রবারের ব্যবহার হইবে। রবারের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। উহা মসিনার তৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ব্রেজিল ও অন্যান্য দেশে রবারের বীজ গরু-ভেড়ার খাদ্য। রবারের বীজ হইতে তৈল

বাহির করিলে যে খইল পাওয়া যায় তাহাও গরু-ভেড়ার খাদ্য ও সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আমাদের দেশে রবারের দ্রব্যাদির ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু রবার দ্বারা নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কারখানা এদেশে নাই বলিলেই চলে। তোমরা বড় হইয়া যদি এদিকে দৃষ্টি দাও, তাহা হইলে দেশের আয়ের একটা পথ মুক্ত হইতে পারে।

চূণ

চূণ দুই প্রকার—বাখারি চূণ ও কলি চূণ। ইহা তিন প্রকার দ্রব্য হইতে পাওয়া যায়। প্রথম—চূণা-পাথর, চা-খড়ি, মর্ম্মর প্রস্তর ইত্যাদি; দ্বিতীয়—ঘুটিং এবং তৃতীয়—ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ, গুগ্‌লি প্রভৃতি প্রাণীর দেহের আবরণ হইতে চূণ প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ এই সকল দ্রব্য পোড়াইলে তাহা হইতে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস্ বা অঙ্গার-অম্ল বাষ্প নির্গত হইয়া ক্যাল্‌সিয়াম্ অক্‌সাইড্ বা চূণ পড়িয়া থাকে।

কাঠ, বাঁশের মুড়া, কয়লা প্রভৃতি দ্বারা ঘুটিং, চূণা পাথর, ঝিনুক প্রভৃতি পোড়ান হয়। চূণ পোড়াইবার জন্য প্রথমে ইট দিয়া ভাটী তৈয়ার করিতে হয়। ভাটীগুলি সাধারণতঃ দেখিতে গোল ও তিন-চারি হাত উচ্চ হয়। বড় বড় ভাটীও আছে। নীচে আগুন ধরাইবার জন্য ও পোড়া চূণ বাহির করিবার জন্য একটি আধ হাত লম্বা ও আধ হাত প্রস্থ ছিদ্র থাকে। ভাটীগুলির উপর প্রায়ই খোলা থাকে, তবে কখনও কখনও ভাটীর পাঁচ-সাত হাত উপরে আচ্ছাদন দেওয়া থাকে।

আজকাল বড় বড় চূণের কারখানায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়

নানাপ্রকারের নূতন ধরণের ভাটী প্রস্তুত হইতেছে। সেগুলির নীচের দিক গোল ও উপরের দিক সরু,—কতকটা মন্দিরের মত দেখায়। ইহাতে কাঠ বা কয়লা কম লাগে অথচ বেশী চূর্ণ পুড়িয়া থাকে। সাধারণতঃ কয়লার ওজনের তিন বা চারি গুণ ঘুটিং বা খড়ি প্রভৃতি এক একটি ভাটীর মধ্যে পোড়ান যায়; তবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ভাটী প্রস্তুত হইলে পাঁচ বা ছয় গুণ পর্য্যন্ত চূর্ণ পোড়ান যাইতে পারে।

চূর্ণারীরা প্রথমে এক স্তর কাঠ বা কয়লার উপর ঘুটিং, চূর্ণা-পাথর প্রভৃতি দেয়। তাহার উপর আর এক স্তর কয়লা বা কাঠ দিয়া ঘুটিং দেয়। এইরূপে স্তরে স্তরে ভাটী সাজাইয়া সর্ব্বনিম্ন স্তরে আগুন ধরাইয়া দেয়। ভাটী আস্তে আস্তে পুড়িলে চূর্ণ ভাল হয়। সেইজন্য ভাটীর গোড়ায় বেশী ছিদ্র রাখা হয় না। ভাটীর মধ্যে বেশী বাতাস প্রবেশ করিলে কয়লা শীঘ্র শীঘ্র পুড়িয়া যায়। এক একটি ভাটী তিন-চারি দিন পর্য্যন্ত জ্বলিয়া থাকে। ১০০ মণ ঘুটিং পোড়াইতে ৩০।৪০ মণ কয়লা লাগে ও উহা হইতে ৫০।৬০ মণ চূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ভাটী দুই রকম। কতকগুলি নূতন ধরণের ভাটী লৌহ কারখানার চুল্লীর মত অনবরত জ্বলিতে থাকে। কেবল ভাটী মেরামতের আবশ্যক হইলে আগুন নিভান হয়। আমাদের দেশে যে সকল ভাটী দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আবশ্যকমত জ্বালান যায় ও তাহার উপরের দিক খোলা থাকায় ভাটায়

ভাল ভাবে আগুন ধরিল কিনা ও উহা কেমন পুড়িতেছে তাহা বুঝা যায়।

চূণা-পাথর, চা-খড়ি প্রভৃতি পোড়ান হইলে উহা গুঁড়া করিয়া চূণ বস্তাবন্দী করা হয়। এই চূণে আর্দ্রবায়ু লাগিলে ইহা নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ইহা ভিজা জায়গায় রাখা উচিত নহে। ঘুটিং পোড়ান হইলে উহা কোনও চৌবাচ্চা বা গর্ত্তে ফেলিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দিতে হয়। তখন ঘুটিংগুলি স্পঞ্জের মত জল শোষণ করে। ইহাকে চূণ ভড়কান বলে। এই চূণে বেশী জল দিয়া চালিয়া লইলে উৎকৃষ্ট চূণ প্রস্তুত হয়। এইরূপ চূণের সহিত বালি, সুরকী, কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া রাজমিস্ত্রীরা গাঁথনির মশলা প্রস্তুত করে। সাধারণতঃ এই কার্য্যের জন্য একভাগ চূণের সহিত তিন-চারি ভাগ বালি বা সুরকী মিশান হয়।

এক প্রকার চূণ বাহিরের জল, বাতাস ও রৌদ্রে ভাল থাকে না ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না; সুতরাং ইহা গৃহের মধ্যে চূণকাম ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঘুটিং, গুগ্লি, শঙ্খ প্রভৃতি পোড়াইয়া যে চূণ পাওয়া যায়, তাহা গাঁথনির কাজের পক্ষে ভাল। সাধারণতঃ গাঁথনির জন্য যে চূণ ব্যবহৃত হয়, তাহাতে কাঁকর, লৌহ ও মৃত্তিকা জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। অতএব উহা বিশুদ্ধ চূণ নহে। শঙ্খ, চা-খড়ি, মর্ম্মর প্রস্তর প্রভৃতি পোড়াইলে উৎকৃষ্ট চূণ পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে ঘুটিং পাওয়া যায়। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে ও অনেক বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে ঝিনুক পাওয়া যায়। বঙ্গের বাহিরে আসামের শ্রীহট্ট জেলায়, বিহারের মানভূম, সিংহভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলায়, যুক্ত-প্রদেশের চূণার ও বিন্ধ্যপর্ব্বতে, মধ্য-প্রদেশে জব্বলপুরে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিচীনপল্লী প্রভৃতি জেলায় ও হিমালয় পর্ব্বতের নানাস্থানে চূণা-পাথর, মর্ম্মর প্রস্তর প্রভৃতি পাওয়া যায়।

পানের সহিত চূণ নিত্য ব্যবহৃত হয়। চূণ উৎকৃষ্ট সার—জমিতে দিলে জমি পরিষ্কার হয়। ট্যানিং বা চামড়া পরিষ্কারের কার্য্যে চূণ প্রভূতপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা কাঁচা চামড়ার লোম, চর্ব্বি প্রভৃতি উঠান হয়।

শিরীষ তৈয়ার করিবার জন্য শিং, খুর প্রভৃতিতে চূণ লাগান হয়। লৌহ, সোডা, সাবান, রঙ, বাতি, গ্লাস ও নানাপ্রকার গ্যাস্ তৈয়ারী করিবার জন্য চূণ আবশ্যক হয়। লৌহ-নির্ম্মিত কোনও দ্রব্য চূণের মধ্যে রাখিলে তাহাতে মরিচা ধরে না; কারণ চূণ বায়ুমধ্যস্থিত আর্দ্রতা শোষণ করিয়া লয়। সীমেণ্ট আজকাল একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস। কেবল সীমেণ্ট দিয়া বড় বড় বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। সীমেণ্টের প্রধান উপকরণ এক প্রকার মাটি ও চা-খড়ি। ডাক্তার ও কবিরাজগণ নানাপ্রকার রোগে চূণ (Calcium) ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

হলুদ ও চূণ বা গুড় ও চূণে মিশ্রিত করিয়া আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে লাগাইলে যন্ত্রণার উপশম হয়। শিশুদিগের অজীর্ণ রোগে চূণের জল উপকারী। তাহা ছাড়া ইহা হাড় শক্ত করে। চূণের ভিতর দিয়া ক্লোরিন বা হরিতক বাষ্প চালাইলে ব্লিচিং পাউডার তৈয়ারী হয়। ইহা দুর্গন্ধ নাশ করে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির সময় ময়লা স্থানসমূহে ও বাটীর চারি পার্শ্বে চূণ ছড়ান হয়, কারণ ইহা বিষ নষ্ট করে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে নবাবগণ পানের সহিত মুক্তা-ভস্ম ব্যবহার করিতেন। মুক্তা ভস্ম করিলে ঝিনুকের চূণের মত চূণ তৈয়ারী হয়। তবে উহা সাধারণ চূণ অপেক্ষা উপকারী এবং উত্তেজক।

কোক কয়লা, আল্‌কাত্‌রা ও রঙ্‌

সাধারণতঃ বাড়ীতে আমরা রান্নার জন্য যে কয়লা ব্যবহার করি, তাহাকে 'কোক কয়লা' বা পোড়া কয়লা বলে। খনি হইতে যে কয়লা তোলা হয়—তাহা কাঁচা কয়লা ; এই কয়লা পোড়াইয়া কোক কয়লা পাওয়া যায়। কয়লার প্রধান উপাদান অঙ্গার বা কার্ব্বন (Carbon)। খনি হইতে যে কয়লা তোলা হয় তাহা পোড়াইলে খুব বেশী ধোঁয়া হয়। সেইজন্য বাড়ীর ভিতরে কাজের জন্য লোকে কাঁচা কয়লা ব্যবহার করেন, কিন্তু রেল, ষ্টিমার, অন্যান্য ইঞ্জিন ও কলকারখানায় লক্ষ লক্ষ মণ কাঁচা কয়লা নিত্য ব্যবহৃত হয়।

কাঁচা কয়লা হইতে কোক কয়লা প্রস্তুত করিবার কয়েক প্রকার রীতি আছে। যে কলে বা চুল্লীতে কাঁচা কয়লা পোড়ান হয় ইংরাজীতে তাহাকে কোক ওভেন (Coke Oven) বলে। সেই চুল্লীতে বড় বড় মৃত্তিকা বা ধাতুর পাত্র পাশাপাশিভাবে সজ্জিত থাকে। সেই সকল পাত্র কাঁচা কয়লা দিয়া ভর্ত্তি করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর কয়লায় আগুন বা গ্যাস্‌ দিয়া তাহা গরম করা হয়।

সেই সময় উহা হইতে যে গ্যাস্ নির্গত হয়, তাহা পাত্রের উপরিস্থিত নল দিয়া চুষিয়া লওয়া হয়। বেশী উত্তাপ পাইলেই কয়লা জ্বলিতে থাকে এবং উহা ঠিকমত পুড়িলে, কলের সাহায্যে পাত্রগুলি সরাইয়া লইয়া উহা চুল্লীর পার্শ্বস্থিত খোলা রেলগাড়ীতে ঢালিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে একটি গাড়ী
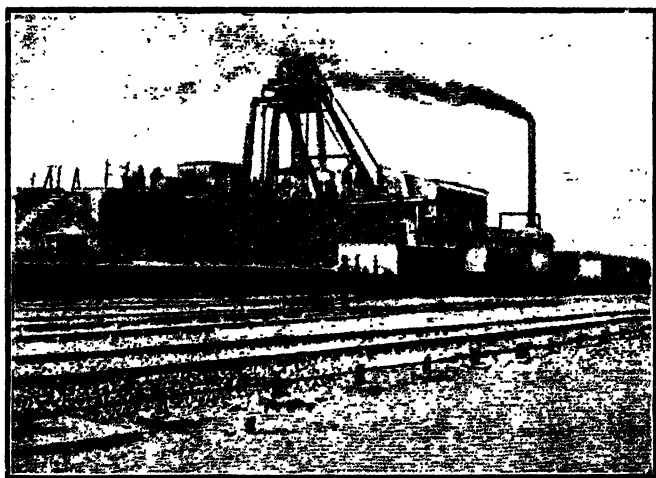
কোক কয়লা প্রস্তুতের কারখানা

জ্বলন্ত কয়লা দ্বারা বোঝাই হইলে উহা কিছুদূরে রেল লাইনের উপরিস্থিত একটি জলপূর্ণ চৌবাচ্চার নীচে লইয়া যায়। উহা হইতে তখন বৃষ্টির জলের মত মুষলধারে বারি বর্ষণ হইতে থাকে। এইরূপে কোক বা পোড়া কয়লা প্রস্তুত হয়। দেশীয়

প্রথায় অনেক খোলা জায়গায় কাঁচা কয়লা স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে কয়লা-গ্যাস্‌ ও অন্যান্য পদার্থ পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, চুল্লীতে কাঁচা কয়লা গরম করিলে প্রথমে যে গ্যাস্‌ পাওয়া যায় উহা অপরিষ্কৃত। সুতরাং সেই গ্যাস্‌ একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্য দিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়। সেই সময় ঐ পাত্রের নীচে গ্যাসের অবিশুদ্ধ পদার্থগুলি জমিয়া একপ্রকার কালো চট্‌চটে পদার্থ বা আল্‌কাত্‌রায় পরিণত হয়। কয়লা-

চুল্লীতে রান্না গ্যাসের আলো
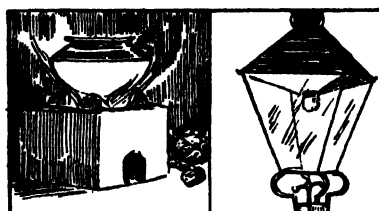
গ্যাস্‌ হইতে আলো জ্বলে, রান্না হয়, কল চলে ইত্যাদি কত কাজ হয়। কলেজের ছেলেরা রসায়নাগারে কয়লা-গ্যাস্‌ জ্বালাইয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা করে। কোক কয়লাতেও কিছু কিছু ধোঁয়া হয়, এইজন্য বড়লোকেরা অনেক স্থানে গ্যাসের চুল্লীতে রান্না করেন। এই সকল চুল্লীর উত্তাপ ইচ্ছামত বাড়ান ও কমান যায় বলিয়া ইহাতে রান্নাও বেশ সুচারুরূপে ইচ্ছামত করা যায়। প্রথম প্রথম কয়লার খনির

বা গ্যাস্ কোম্পানীর মালিকেরা এই কুৎসিত পদার্থ—আল্‌কাত্‌রা—লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গরিব লোকেরা জানালা-কপাট, তীর-বরগা প্রভৃতিতে উহা অল্প
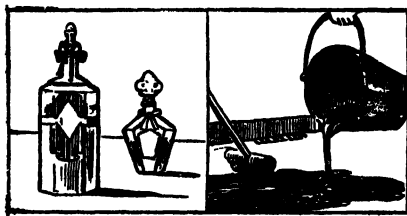
সুগন্ধি দ্রব্য রাস্তার পিচ্

অল্প ব্যবহার করিলেও জিনিসটি আর কি কাজে লাগাইবেন—তাহা তাঁহারা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই আল্‌কাত্‌রা এখন একটি অত্যাবশ্যক সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন উহা হইতে রাস্তায় দিবার পিচ্, নানাপ্রকার রঙ্, মূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্য, কত প্রকার অত্যাবশ্যক ঔষধ, ফিনাইল-নামক শোধক দ্রব্য, আমোনিয়া-নামক ঔষধ ও জমির সার, ফটোগ্রাফের ডেভেলপার, ন্যাপথালীন-নামক কীট-

ঔষধ ফিনাইল
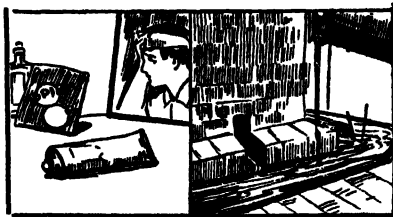
নাশক ঔষধ, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি—এমন কি চিনি হইতে ২২০ গুণ বেশী মিষ্ট স্যাকারিন-নামক পদার্থ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে! সুতরাং আল্‌কাত্‌রা দেখিয়া ঘৃণা করিবার আর কিছুই নাই।

কোক কয়লা, আল্‌কাত্‌রা ও রঙ্‌

অল্প উত্তাপে কয়লা পোড়াইয়া বৈজ্ঞানিকেরা তাহা হইতে ধোঁয়াহীন কয়লা, ইঞ্জিন, গাড়ীর চাকা প্রভৃতিতে দিবার জন্য লুব্রিকেটিং তৈল, পেট্রোলের মত তৈল প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। অনেকে আশা করেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে কয়লা হইতে প্রস্তুত পেট্রোল মাত্র দুই আনা গ্যালন দরে বিক্রয় হইবে। আজ-কাল এক গ্যালন পেট্রোলের দাম কলিকাতায় আঠার আনা।

চায়ের পেয়ালায় স্যাকারিন   নানাপ্রকার দ্রব্য

মজার কথা এই যে, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—হীরা ও কয়লা একই পদার্থ। কয়লা হইতে তাঁহারা নকল হীরা প্রস্তুত করিতেও সমর্থ হইয়াছেন! এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটির আবিষ্কার-কাহিনী পড়িলে চমৎকৃত হইতে হয় এবং বৈজ্ঞানিক ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হইয়া পড়ে।
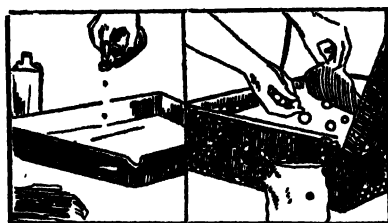
ফটোগ্রাফের ডেভেলপার   কীটনাশক ন্যাপথালীন

কোনও পাত্র আল্‌কাত্‌রা দিয়া ভর্ত্তি করিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া গরম করিলে উহা হইতে যে বাষ্প নির্গত হয়, তাহা জলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া ঠাণ্ডা করিলে প্রথমে হাল্কা তৈলাদি ও পরে কারবলিক তৈল, ক্রিয়োজোট তৈল, এনথ্রালিক তৈল প্রভৃতি নানাপ্রকার অত্যাবশ্যক ঔষধাদি পাওয়া যায়।

আল্‌কাত্‌রা গরম করিয়া প্রথমে যে হাল্কা তৈল পাওয়া যায়, তাহা শোধন করিলে 'বেন্‌জিন' (Benzene) নামক
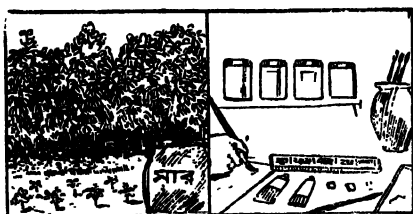
আমোনিয়া সার রকমারি রঙ্‌

এক প্রকার রঙ্‌হীন তরল পদার্থ পাওয়া যায়। এই বেন্‌জিনের সহিত নাইট্রিক্‌ এসিড্‌, হাইড্রোজেন বা উদ-জান বাষ্প প্রভৃতি মিশাইয়া 'এনিলাইন' (aniline) নামক রঙ্‌হীন তৈলাক্ত তরল পদার্থ পাওয়া যায়। এই এনিলাইনের সহিত আবার অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য মিলাইয়া, বেগুনে, সবুজ, লাল, নীল, হল্‌দে প্রভৃতি নানাপ্রকার মনোহর রঙ্‌ পাওয়া যায়। এইরূপে অন্যূন সাত শত প্রকার রঙ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি

উহা হইতে প্রস্তুত হয়। এই এনিলাইন আবিষ্কার করেন একজন ইংরাজ; কিন্তু আজ জার্ম্মাণী পৃথিবীর রঙের বাজার দখল করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন কৃত্রিম রঙের প্রায় বারো-আনা ভাগ রঙ্‌ এখন জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত হয়। অন্যান্য নানাপ্রকার আবিষ্কার-কাহিনীর মত এনিলাইনের আবিষ্কার-কাহিনীও চমৎকার ও শিক্ষাপ্রদ।

মিঃ পার্কিন নামক ১৮ বৎসর বয়সের এক যুবক লণ্ডনের রাজকীয় রাসায়নিক কলেজে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নকল কুইনাইন প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেন। একদিন পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি কালো অপরিষ্কৃত একপ্রকার গুঁড়া পাইলেন। উহা যে কোন্‌ কাজে লাগিবে, তাহা তাঁহার আদৌ মনে হয় নাই। যাহা হউক, ঐ গুঁড়াগুলি ধুইয়া ফেলিবার সময় তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, উহা হইতে উৎকৃষ্ট বেগুনে রঙ্‌ প্রস্তুত হইতেছে। উহার এক বৎসর পর মিঃ পার্কিন ও তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাদের পিতার কষ্টার্জ্জিত অর্থে ইংলণ্ডের হ্যারো নামক সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রীণফোর্ড-গ্রীণ নামক স্থানে এক রঙের কারখানা স্থাপন করেন। দেখিতে দেখিতে দু-এক বৎসরের মধ্যে সেই কারখানায় প্রস্তুত কৃত্রিম রঙে দেশ ছাইয়া গেল। কাপড়-চোপড়, জাহাজ, গাড়ী, দরজা-জানালা প্রভৃতিতে এই রঙের ব্যবহার হইতে লাগিল। তাহার পর গ্রেব, লাইবারম্যান, বেরার প্রভৃতি রাসায়নিকগণের গবেষণার ফলে এই রঙ্‌-শিল্প

উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে লাগিল এবং নকল রঙের কাটতি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল।

ষাইট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ও বিহার প্রদেশের নানা স্থানে বহু নীলকুঠি ছিল। তখন ভারতীয় নীল দেশ-বিদেশে চালান হইত। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই নীলকুঠিগুলি স্থানে স্থানে জীর্ণ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। আমরা এখন রঙের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি। উপস্থিত আমাদের দেশে কোক কয়লা, আল্‌কাত্‌রা, আমোনিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইলেও রঙের কোনও বড় কারখানা নাই। তোমাদের কাপড়, শাড়ী, জামা প্রভৃতির রঙের কি বাহার! কিন্তু মনে রাখিও অধিকাংশ রঙই কালো, কুৎসিত পদার্থ আল্‌কাত্‌রা হইতে প্রস্তুত! দোলের সময় হোলি খেলিবার জন্য তোমরা যে ম্যাজেণ্টা ও অন্যান্য রঙ্‌ ব্যবহার কর, তাহাও 'এনিলাইন' হইতে প্রস্তুত! উহাকে আমরা বৈজ্ঞানিকের বা আল্‌কাত্‌রার জয় বলিতে পারি।

লৌহ

অতি প্রাচীনকাল হইতে লৌহের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। সমস্ত ধাতুর মধ্যে লৌহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যকীয়, সেইজন্য অনেকসময় ইহাকে 'ধাতুর রাজা' বলা হয়। লৌহ না থাকিলে নানাপ্রকার কল, কারখানা, রেল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারিত না এবং বর্ত্তমান সভ্যতাও এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

লৌহ নানাপ্রকার প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। লৌহ-মিশ্রিত প্রস্তর লাল, কালো বা সবুজ বর্ণের হয়। খনি হইতে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড উঠাইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গা হয়। বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ প্রদেশে এইরূপ প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বিহার ও উড়িষ্যার গুরুমহিষানি প্রভৃতি স্থানে এত লৌহ-মিশ্রিত প্রস্তর আছে যে, উহা পৃথিবীর যে কোনও দেশের লৌহখনির পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী এবং এই সকল প্রস্তরে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ লৌহ আছে। গ্রীণল্যাণ্ড দেশের কোথাও কোথাও লৌহ অবিমিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

গরম হাওয়া দিবার বন্দোবস্ত থাকে এবং ইহা একবার জ্বালিলে

হাওয়া-দেওয়া বৃহৎ চুল্লী (Blast Furnace)

(মেরামতের বিশেষ আবশ্যক না হইলে) বিশ-ত্রিশ বৎসরের

গরম হাওয়া দিবার বন্দোবস্ত থাকে এবং ইহা একবার জ্বালিলে

হাওয়া-দেওয়া বৃহৎ চুল্লী (Blast Furnace)

(মেরামতের বিশেষ আবশ্যক না হইলে) বিশ-ত্রিশ বৎসরের

মধ্যে নিভান হয় না। কারণ এই চুল্লীগুলি এত বৃহৎ ও উহাতে উত্তাপের পরিমাণ এত বেশী আবশ্যক হয় যে, একবার নিভাইলে, চুল্লী আবার গরম করিতে বহু টাকার কয়লার আবশ্যক হয় এবং চুল্লী ঠাণ্ডা হইলে সঙ্কোচনের জন্য উহা ফাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং লৌহের কারখানা মাত্রেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লৌহ প্রায় সকল সময়েই প্রস্তুত হয়।

এই সকল চুল্লী প্রস্তুত করিবার জন্য বেশ শক্ত ও অগ্নিসহ (Fire proof) ইট ব্যবহার করা হয়। গাঁথনি যতদূর সম্ভব দৃঢ় করা হয়। তাহার পর সমস্ত চুল্লীটি শক্ত লোহার পাত দিয়া মুড়িয়া ফেলা হয়। ইহাতে বাতাস দিবার নল ও গ্যাস্ বাহির করিবার নল থাকে। অতিরিক্ত গরম হইয়া চুল্লী যাহাতে ফাটিয়া না যায়, এইজন্য বহির্ভাগে জলের নল লাগান থাকে। নীচে গলিত লৌহ ও অপরিষ্কৃত দ্রব্যাদি বাহির করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ মুখ থাকে। কারখানার মধ্যে এই সকল চুল্লীর সু-উচ্চ চিম্‌নীগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই চুল্লীর উপরদিক হইতে স্তরে স্তরে লৌহ-প্রস্তর, চূণা-পাথর ও কয়লা ঢালিয়া দেওয়া হয়। চুল্লীর দুই পার্শ্বেই রেল লাইন। খনি হইতে খণ্ড খণ্ড লৌহ-প্রস্তর, চূণা-পাথর ও কয়লা বোঝাই মালগাড়ী আসিয়া চুল্লীর পাশে দাঁড়ায়। এই সকল মাল বোঝাই করিবার নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ 'ট্রলি' বা গোল পিপার মত মাল বোঝাই করিবার গাড়ী lift বা

উত্তোলনকারী যন্ত্রের সাহায্যে উঠা-নামা করে। একটি পাত্র লৌহ-প্রস্তর ও চূণা-পাথরে বোঝাই হইবা মাত্র উহা উপরে উঠিতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কয়লা বোঝাই করিবার পাত্র নীচে নামিয়া আসিতে থাকে। তাহা দেখিতে বেশ চমৎকার। মাল বোঝাই করা, উপরে উঠান, চুল্লীতে ঢালা ও পুনরায় খালিপাত্র নামান—সমস্তই কলের সাহায্যে হইতেছে। উহা দূর হইতে দেখাই ভাল; কারণ দৈবাৎ তুই একটি প্রস্তর বা কয়লার খণ্ড পাত্র হইতে পড়িয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, এইরূপে চুল্লীটি পূর্ণ হইলে উহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কারণ এই চুল্লী জ্বলিয়া যে গ্যাস্ উৎপন্ন হয়, তাহা নলের সাহায্যে লইয়া গিয়া অন্য কার্য্যে লাগান হয়। ৩০।৩২ ঘণ্টা পরে লোহা ভারী জিনিস বলিয়া গলিয়া চুল্লীর নীচে জমা হয় ও অপরিষ্কৃত জিনিসগুলি চূণের সহিত মিশিয়া উপরে ভাসিতে থাকে। এই সময় বিচক্ষণ কারিগর ও রাসায়নিকগণ লৌহের সামান্য একটু নমুনা লইয়া দেখেন যে, ঠিক মত লৌহ তৈয়ার হইয়াছে কিনা। তাহার পর চুল্লীর মুখ খুলিয়া দিয়া একদিকে গলিত লৌহ ও অপর দিকে অপরিষ্কৃত দ্রব্যাদি বা slag বড় বড় বাল্‌তিতে পূর্ণ করা হয়।

এইরূপ এক-একটি বাল্‌তিতে ৩০০ মণ গলিত লৌহ ধরে। গলিত লৌহ পড়িবার সময় তাহা হইতে তুব্‌ড়ীর মত প্রচুর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকে। সকল সময়ে—বিশেষতঃ

রাত্রিকালে—তাহা দেখিতে বড় সুন্দর। এইরূপে এক-একটি বাল্‌তি গলিত লৌহে পূর্ণ হইলে, তাহা ওজন করিয়া কপিকলের সাহায্যে স্থানান্তরিত করা হয় বা একেবারে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। অপরিষ্কৃত পদার্থে বোঝাই বাল্‌তিও রেলের সাহায্যে স্থানান্তরিত করা হয়।

টাটার লৌহ-কারখানার চারিপার্শ্বে এইরূপ অপরিষ্কৃত জিনিস, ছাই প্রভৃতি স্তূপাকারে পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া আছে। ইহাতে কারখানাটি একটি দুর্গের মত হইয়াছে। বড় বড় গাল-বোঝাই বাল্‌তিগুলি যখন কপিকলের সাহায্যে অনায়াসে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হয়, আবার কলের সাহায্যে বাল্‌তির গলিত ধাতু অন্যপাত্রে ঢালা হয়, তখন যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। দৈবাৎ এইরূপ একটি বাল্‌তি ছিঁড়িয়া পড়িলে, বহু শ্রমিকের প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য কারখানার প্রধান প্রবেশদ্বারে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"সর্ব্বাগ্রে সাবধান হউন, আজীবন পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হইয়া থাকা অপেক্ষা সাবধান হওয়া ভাল।" এইরূপে যে লৌহ প্রস্তুত হয় তাহাকে pig iron বলে। জামসেদপুর ছাড়া আসানসোলের নিকটবর্ত্তী কুল্‌টি, হীরাপুর প্রভৃতি স্থানেও pig iron প্রস্তুত হয়। এই লৌহ হইতে পরে ইস্পাত প্রস্তুত হয় বা অন্যান্য ঢালাই-কার্য্য হয়।

ইস্পাত

ইস্পাত, সাধারণ লৌহ বা pig iron অপেক্ষা হাল্কা অথচ দৃঢ়। সাধারণ লৌহ বক্র করিতে গেলে অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু ইস্পাত ইচ্ছামত বক্র করা যায় ও লৌহ অপেক্ষা বেশী দিন স্থায়ী হয়; কারণ উহাতে শীঘ্র মরিচা পড়ে না। ইস্পাত পাত্‌লা হইলেও উহা শাণে দেওয়া যায়; সুতরাং ছুরী, কাঁচি, দা, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র উহাতে প্রস্তুত হয়। রেল, ট্রাম প্রভৃতির লাইন, বড় বড় জাহাজ, ইঞ্জিন, নানাবিধ কলকব্জা, বৃহৎ বৃহৎ লৌহসেতু—এমন কি সূচ পর্য্যন্ত ইস্পাতে তৈয়ারী হয়।

সাধারণ লৌহ হইতে ইস্পাত নানাপ্রকারে তৈয়ারী হয়। তবে সাধারণতঃ সার হেন্‌রী বেসেমারের উদ্ভাবিত প্রথাই চলিত। সাধারণ লৌহে কয়লা বা কার্ব্বন জাতীয় পদার্থ বেশী থাকে। বাজারে যে সকল ঢালা কড়াই বিক্রয় হয় উহা pig iron বা সাধারণ লৌহে প্রস্তুত বলিয়া উহা নাড়া চাড়া করিলে হাতে কালো দাগ লাগে; কিন্তু ভাল ছুরী, কাঁচি বা ক্ষুর দেখিতে কি উজ্জ্বল! সাধারণ লৌহ হইতে কয়লা বা অন্যান্য মিশ্রিত পদার্থ বাহির করিয়া ফেলিলে ইস্পাত প্রস্তুত হয়।

Blast furnace বা হাওয়া-দেওয়া চুল্লীতে লৌহ প্রস্তুত হইবার পর, গলিত অবস্থায় উহা বড় লম্বাকৃতি বালতির মত পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ঐরূপ এক-একটি পাত্রে প্রায় ১৬০ মণ গলিত লৌহ ধরে। ঐ পাত্রের তলদেশে কয়েকটি বন্ধ-করা ছিদ্র থাকে। পাত্রে লৌহ ঢালা হইলে ও উহা ঠিকমত বসান হইলে ঐ ছিদ্রগুলি খুলিয়া দিয়া খুব জোরে ফুটন্ত লৌহের মধ্যে বাতাস দেওয়া হয়। বাতাসের জোর এত বেশী থাকে যে, ছিদ্রের মধ্য দিয়া গলিত ধাতু আদৌ বাহির হইতে পারে না। সেই সময় লৌহ ফুটিতে থাকে ও উহার মধ্যস্থিত কয়লা জাতীয় পদার্থ তুবড়ীর মত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। লৌহের মধ্যস্থিত অন্যান্য কয়েকটি পদার্থ বায়ুস্থিত অক্সিজেনের বা অম্লজান বাষ্পের সহিত মিশিয়া যায়।

এইরূপে প্রায় কুড়ি মিনিট হাওয়া দিবার পর, লৌহ বিশুদ্ধ হইলে, পাত্রের ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পরে উহাতে পরিমাণমত ফেরো ম্যান্‌গানীজ (Ferro manganese) ও অন্যান্য দ্রব্য মিশান হয়। এইস্থানে ইহা বলা আবশ্যক যে, ম্যান্‌গানীজ একপ্রকার ধাতু। ভারতবর্ষের মধ্য-প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ম্যান্‌গানীজ-মিশ্রিত লৌহ অপেক্ষাকৃত শক্ত হয়; এমন কি উহার দ্বারা লৌহ পর্য্যন্ত কাটা যায়। যাহা হউক, যে যন্ত্রে ইস্পাত প্রস্তুত হয়, তাহাকে ইংরাজীতে 'কন্‌ভার্টার' (Converter) বলে; কারণ উহাতে

লোহের অবস্থা রূপান্তরিত হইয়া ইস্পাতে পরিণত হয়। রাত্রিতে
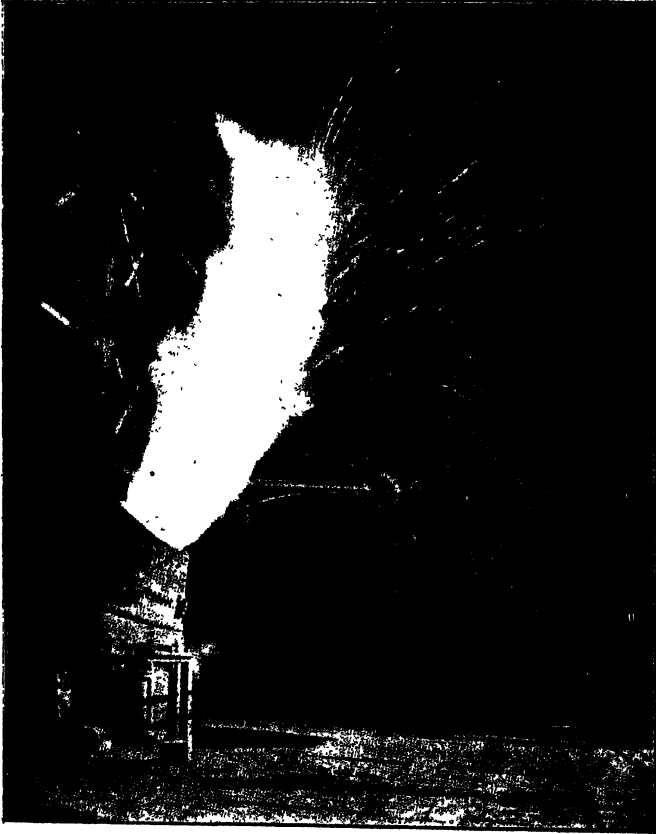
Converter বা পরিবর্ত্তনকারী যন্ত্র

Converter বা পরিবর্ত্তনকারী যন্ত্রের কার্য্য দেখিতে বড়ই

সুন্দর। কারণ তখন উহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহুদূর হইতে দেখা যায়। পনেরো-বিশ মিনিট যাবত একস্থান হইতে শতাধিক ভাল ভাল তুবড়ীর মত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একযোগে বহির্গত হইতে থাকে! যে সকল সুদক্ষ লোক ঐ সকল যন্ত্রে কাজ করে, তাহাদিগের ক্ষিপ্রকারিতা ও কার্য্যতৎপরতা দেখিবার মত। মুখে কথা নাই, অথচ সকলে যন্ত্রের মত নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে। হৈ-চৈ আদৌ নাই, কিন্তু একটু এদিক-ওদিক হইলেই সর্ব্বনাশ! ভারতীয় শ্রমিক, নিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত যন্ত্রের মত কাজ করিতেছে দেখিলে মনে কত আনন্দ হয়!

Converter বা পরিবর্ত্তনকারী যন্ত্রে প্রবল বাতাস দিয়া লৌহ বিশুদ্ধ করা ব্যতীত উহার সহিত চূণা-পাথর, ফেরো ম্যান্‌গানীজ, ডলোমাইট প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া দশ-বারো ঘণ্টা ফুটাইলে উহা আস্তে আস্তে বিশুদ্ধ হয়। এই সকল চুল্লীতে লৌহ যখন ফুটিতে থাকে, তখন নীল চশমা দিয়া উহা দেখিতে চমৎকার লাগে।

যাহা হউক, ইস্পাত প্রস্তুত হইলে, তাহা বড় বড় পাত্র বা ladle-এ ঢালা হয়, এবং ঐগুলি কপিকলের সাহায্যে ছাঁচের উপর লইয়া গিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। ঐ পাত্রের নীচেকার একটি ছিদ্র আবশ্যকমত খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারা যায়। ছাঁচের উপর পাত্রটি বসান হইলে উহার তলদেশের ছিদ্রটি খুলিয়া দেওয়া হয় ও সাধারণতঃ চার-পাঁচ হাত লম্বা ও দেড় হাত
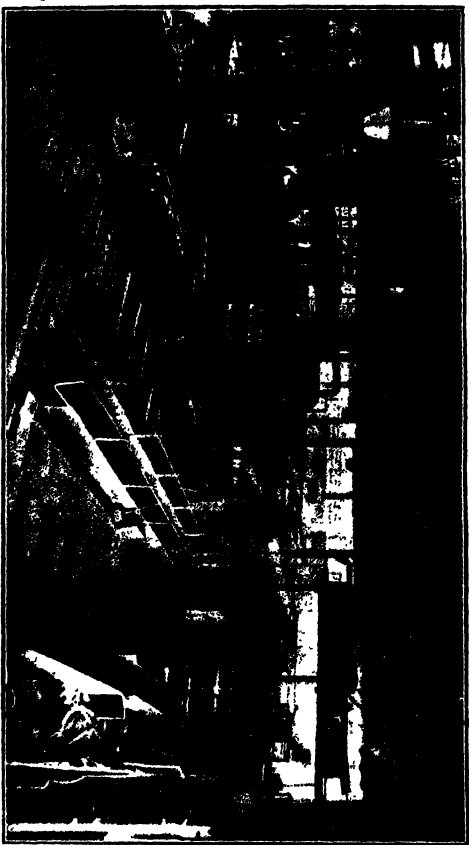
রোলিং মিল (Rolling mill)

প্রস্থ ইস্পাতের ingot বা পিণ্ড প্রস্তুত হয়। পরে ঐগুলি rolling mill বা পেষণ-যন্ত্রে অথবা অন্যান্য যন্ত্রে লইয়া গিয়া রেল, কড়ি, বরগা, করোগেট, লোহার চাদর প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। টাটার লৌহ-কারখানায় নানাপ্রকার ইস্পাতের বহু চৌকা বা পিণ্ড প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বদা মজুত থাকে। আবশ্যকমত উহা হইতে বহু রকমের মাল তৈয়ারী হইয়া দেশ-বিদেশে চালান যায়।

লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত এবং তাহার পরে Rail mill, rolling mill, bar mill প্রভৃতির অধিকাংশ কার্য্য—এমন কি তৈয়ারী মাল রেলগাড়ীতে বোঝাই করা পর্য্যন্ত কলের সাহায্যে হইয়া থাকে।

গ্রাফাইট

তোমরা 'গ্রাফাইট' (Graphite) দেখিয়াছ কি? অনেকেই হয়ত উত্তর করিবে, "না"; অথচ ইহা তোমরা নিত্য ব্যবহার করিতেছ। জিনিসটি কি তাহা না জানায় ইহা তোমাদের নিকটে থাকিলেও তাহা দেখাইয়া দিতে পারিতেছ না।

গ্রাফাইট এক প্রকার খনিজ পদার্থ। গ্রীক্ ভাষায় Grapho (গ্রাফো) শব্দের অর্থ লেখা। তাহা হইতেই গ্রাফাইট শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রাফাইট দ্বারা কাগজে লেখা যায় বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে।

তোমরা সকলেই পাথুরিয়া কয়লা দেখিয়াছ। বৈজ্ঞানিকদের মতে পাথুরিয়া কয়লা, হীরা, গ্রাফাইট প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য এক জাতীয় পদার্থ। পুরাতন পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্যে অনেক সময় স্তরে স্তরে গ্রাফাইট সাজান থাকে, কখনও কখনও পাহাড়ের মধ্যে গ্রাফাইটের বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডও পাওয়া যায়। দেখিতে কালো বলিয়া পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতেন যে, ইহার সহিত বোধ হয় সীসা (lead) মিশ্রিত আছে। সেইজন্য কেহ কেহ তখন ইহার নাম দিয়াছিলেন কালো সীসা (black lead বা plumbago)।

তোমাদের সকলেরই 'লেড্ পেন্সিল' আছে। উহার ভিতরে যে কালো শীষটি দেখিতেছ, উহা প্রধানতঃ গ্রাফাইট ও

মাটি মিশাইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। পেন্সিল তৈয়ারী করিতে হইলে গ্রাফাইট ও মাটি প্রথমে উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হয়। তাহার পর, এই দুইটি জিনিস উত্তমরূপে মিশান হইলে, উহাতে জল দিয়া চট্‌কাইতে বা মর্দ্দন করিতে হয়। তখন ইহা চট্‌চটে আঠার মত পদার্থে পরিণত হয়। এই চট্‌চটে পদার্থ দুইমুখ-খোলা সরু নলের মধ্যে চাপ দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলে লম্বা লম্বা সরু শীষ প্রস্তুত হয়। ইহা অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করিয়া লইলেই পেন্সিলের ভিতরকার শীষ প্রস্তুত হয়। শীষ আবশ্যকমত ছোট বা বড় করা যাইতে পারে। রঙীন পেন্সিলের শীষ প্রস্তুত করিতে হইলে গ্রাফাইট ও মাটির সহিত আবশ্যকমত রঙের গুঁড়া মিশাইয়া লইতে হয়।

দুই খণ্ড খাঁজ-কাটা কাঠের মধ্যে এই শীষ প্রবেশ করাইয়া কাঠ দুইটি আঠা দিয়া উত্তমরূপে জুড়িয়া দিলে পেন্সিল প্রস্তুত হয়। পেন্সিলের কাঠ সরু, মোটা, গোল, চৌ-কোণ, লম্বা, ছোট প্রভৃতি কত রকমের হয়। এই কাঠের উপর ইচ্ছামত রঙ, বার্নিশ, পেন্সিলের নাম, প্রস্তুতকারকের নাম ইত্যাদি ছাপ দিয়া লইলে পেন্সিল বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী হয়। যে কোনও একটি পেন্সিল লইয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখ, পেন্সিলের কাঠ দুইটি কেমন সুন্দরভাবে জোড়া আছে। ধনী লোকেরা অনেক সময় কাষ্ঠাধারে রক্ষিত পেন্সিল ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বাজার হইতে কেবল শীষটি কিনিয়া

লইয়া উহা সোনা বা রূপার আধারে ভরিয়া লন। নরম, শক্ত, খুব শক্ত, মাঝারি রকমের শক্ত ইত্যাদি কত রকমের পেন্সিল আছে। গ্রাফাইট, মাটি, রঙ্ প্রভৃতি মিশ্রণের অনুপাত অনুসারে ভাল, মন্দ, নরম, শক্ত ইত্যাদি নানা প্রকারের পেন্সিল তৈয়ারী হয়। ভাল বা মন্দ গ্রাফাইট ও অন্যান্য উপকরণের উপরও ইহা নির্ভর করে। ভাল পেন্সিলের কাঠগুলি সাধারণতঃ নরম ও শীষগুলি শক্ত হয়। ইহাতে বেশ আরামের সহিত লেখা যায় ও ইহার দাগগুলি বেশ স্পষ্ট ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। আর কাঠগুলি নরম হওয়ার দরুণ ছুরী দিয়া পেন্সিল কাটিতে কোন অসুবিধা হয় না এবং শীষটিও ভাঙ্গিয়া যায় না। পেন্সিলের কারখানায় নিত্য হাজার হাজার পেন্সিল প্রস্তুত হয়। তথায় গ্রাফাইট চূর্ণ করা, শীষ প্রস্তুত, কাষ্ঠাধার প্রস্তুত, রঙ্ করা, ট্রেডমার্ক প্রভৃতির ছাপ দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ আছে এবং ইহার প্রায় অধিকাংশ কাজই কলের সাহায্যে হয়। আজকাল কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি সহরে পেন্সিল প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু এখনও ব্যাভেরিয়া, অষ্ট্রিয়া, জাপান, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ হইতে পেন্সিল বহুল পরিমাণে ভারতবর্ষে চালান আসে।

এখন দেখ 'লেড্ পেন্সিল' নামটি কত ভ্রমাত্মক, কারণ ইহার শীষ সীসা দ্বারা প্রস্তুত নহে। কেহ কেহ আবার ইহাকে

'উড্ (wood) পেন্সিল' বলেন। ইহাও ভুল, কারণ কাষ্ঠাধারে রক্ষিত হইলেও আমরা কাঠ দিয়া কাগজের উপর লিখি না।

গ্রাফাইটের গুঁড়া দ্বারা নানাবিধ ধাতুর দ্রব্য, বিশেষতঃ নানাপ্রকার কল, বৃহৎ বৃহৎ চুল্লী বা উনানের লৌহের শিক প্রভৃতি পরিষ্কার করা হয়। ধাতুর দ্রব্য পালিশ করিবার জন্য বাজারে যে সকল 'মেটাল (metal) পালিশ' বা ধাতুর পালিশ বিক্রয় হয় তাহাতে অনেক সময় কালো কালো গ্রাফাইটের গুঁড়া মিশান থাকে।

গ্রাফাইট শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না বলিয়া, যে সকল ছাঁচে গলিত ধাতু ঢালিয়া নানা প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাতে অনেক সময় ইহা লেপন করিয়া দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে অনেক সময় কাদা, বালি ও গ্রাফাইট মিশাইয়া নানাপ্রকার ছাঁচ, ছোট ছোট বাটী (crucibles) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া আরও কত প্রকার কাজে ইহা লাগে।

আমাদের এই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি লঙ্কা দ্বীপ, ভারতবর্ষ, সাইবিরিয়া, জাপান, কানাডা, জার্ম্মাণী, ইতালী, মাদাগাস্কার প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়; কিন্তু উৎকৃষ্ট পেন্সিল তৈয়ারীর জন্য সাইবিরিয়ার গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়, কারণ সেই দেশের গ্রাফাইট পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

খনিজ তৈল

তৈল অনেক রকমের আছে। সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, তিল তৈল, রেড়ীর তৈল (castor oil), ইউক্যালিপ্টাস্ তৈল প্রভৃতি তৈলকে উদ্ভিজ্জ তৈল বলে, কারণ এইগুলি উদ্ভিদ্ হইতে জন্মে। গরু, ভেড়া, ছাগল, সাপ, মাছ, তিমি প্রভৃতি হইতে যে চর্ব্বি বা তৈল পাওয়া যায় তাহাকে প্রাণীজ তৈল বলে। মাখন এবং ঘৃতও প্রাণীজ তৈল। কেরোসিন তৈল, পেট্রোল, প্যারাফিন, কারবলিক তৈল প্রভৃতিকে খনিজ তৈল বলে, কারণ এইগুলি একেবারে খনি হইতে বা খনিজ দ্রব্যাদি হইতে পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষ খনিজ তৈলের কথা জানিত। কূপ, পুষ্করিণী, ঝরণা, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জলে অনেক সময় তৈল বা তৈলাক্ত পদার্থ ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই তৈল কোথা হইতে আসে, ইহা অনুসন্ধান করিতে করিতে মানুষ প্রথমে মাটির নীচে তৈলের সন্ধান পায়। প্রাচীন নিনেভে ও ব্যাবিলনে তৈলের কূপ ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। পারস্যের উত্তরাঞ্চলের লোকে বহুকাল

হইতে তৈল বা গ্যাস্ হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে পবিত্র অগ্নি (holy fire) রূপে পূজা করিয়া আসিতেছে।

প্রাচীন যুগের মানুষ এই তৈলের কথা জানিলেও ইহার ব্যবহার জানিত না। একশত বৎসরেরও কথা নহে,—মাত্র ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই তৈলের শোধনপ্রণালী আবিষ্কার হওয়ার পর হইতে—সমগ্র পৃথিবীতে ইহার ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে। এখন আমরা আলো জ্বালিবার জন্য, রান্না করিবার জন্য, রেল, মোটর ও নানাবিধ কল ও ইঞ্জিন চালাইবার জন্য এবং ঐগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য, ঔষধের জন্য—এরূপ কত প্রকারে যে ইহা নিত্য ব্যবহার করিতেছি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

মৃত্তিকা-ভেদকারী যন্ত্রের (boring machine) সাহায্যে প্রথমে এই তৈলের সন্ধান লইতে হয়। তাহার পর যেখানে তৈলের ঝরণার সন্ধান পাওয়া যায়, তথায় কূপ খনন করিলে বা মৃত্তিকা-মধ্যে টিউবওয়েলের বা নলকূপের মত নল প্রবেশ করাইয়া দিলে এই তৈল পাওয়া যায়। এইজন্য হস্ত, বাষ্প বা বৈদ্যুতিক শক্তি সাহায্যে চালিত যন্ত্রাদির ব্যবহার হয়। তোমাদের বাটীর কূপ ২০ বা ২৫ ফুট মাত্র গভীর, কিন্তু সাধারণতঃ চারি বা পাঁচ শত ফুট নীচে এইরূপ তৈল পাওয়া যায়। ভাবিয়া দেখ, তৈলকূপগুলি কত গভীর! তৈলের ঝরণা হইতে তৈল অনেক সময় আপনা-আপনি বাহির হয়,

আবার অনেক স্থানে উত্তোলনকারী যন্ত্রের (pump) সাহায্যে তৈল তুলিতে হয়। প্রথমে আমরা যে অপরিষ্কার তৈল পাই, তাহা ব্যবহারের উপযুক্ত নহে ; পরিষ্কার করিয়া লইলে ইহা ব্যবহারের উপযোগী হয়। ইংরাজীতে এই তৈলকে petroleum বা পাথরের তৈল বলে। আমরা ইহাকে কেরোসিন (kerosene) তৈল বলি, ইহাও ইংরাজী কথা। হিন্দীতে ইহাকে 'মাট্টিকা তেল' বলে।

মাটির নীচে কিরূপে বা কোথা হইতে এই তৈল আসিল তাহা বলিতে পার কি? এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, যুগযুগান্তর হইতে বহু উদ্ভিদ্ ও প্রাণী মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত থাকায় উহাদের তৈল বা চর্ব্বি মাটির মধ্যে পাওয়া যায়। মাটির উপর আমরা মানুষ, হাতী, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি কত প্রকার প্রাণী ও কত প্রকার গাছ দেখিতে পাই! বিশাল সমুদ্রেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, মাছ, হাঙ্গর, তিমি প্রভৃতি কত ছোট-বড় প্রাণী ও উদ্ভিদ্ আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভূমিকম্পাদি নৈসর্গিক কারণে এইগুলি অনেক সময় মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায় এবং ইহাদের তৈল ও চর্ব্বি মৃত্তিকা-মধ্যে সঞ্চিত থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, মাটির অন্যতম উপাদান অঙ্গার (carbon) ও জলযান বাষ্প (hydrogen) ভূগর্ভে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত হইয়া তৈলরূপে পরিণত

হইয়াছে। উৎসবের সময় তোমরা অনেকেই কার্‌বাইডের (carbide) আলো জ্বালিয়া থাকিবে। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে, প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীর উত্তাপ খুব বেশী ছিল, তখন কোনও কোনও পাথরের মধ্যে কার্‌বাইড্ আপনা-আপনি প্রস্তুত হইত। কালক্রমে এই কার্‌বাইড্ মাটি চাপা পড়ায় এবং উহার সহিত জল বা জলীয় পদার্থের যোগ হওয়ায় ভূগর্ভে এসিটিলিন (acetylene) গ্যাসের সৃষ্টি হয়। ইহাই পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈলরূপে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, যে সকল মাটির স্তর, প্রস্তর প্রভৃতির নীচে এই তৈল আছে, তাহার উপর অন্য মাটি বা প্রস্তরের স্তরের চাপ পড়িয়া, সচ্ছিদ্র মাটি বা প্রস্তরের স্তর দিয়া এই তৈল ঝরণার মত বাহির হয়। ইহাই আমরা কূপ, ঝরণা প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করি।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী বাকুতে কতকগুলি তৈল-কূপ খনন করা হয়, কিন্তু ঐ সকল গভীর কূপ খনন করিবার সময় মাটি ধ্বসিয়া পড়িয়া বহু শ্রমিকের প্রাণ যায়। এইজন্য একজন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি করিয়া লোহার ফাঁপা একটি নল মৃত্তিকা-মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ভাগ্যক্রমে ঐ নল একটি তৈলের ঝরণার সংস্পর্শে আসায় তৈল জোরে আপনা-আপনি বাহির হইতে থাকে। অনুমান ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মিঃ গাইলেড পিবেক নামক একজন ভদ্রলোক আমেরিকার

ট্যাঙ্কার বা তৈলবহনকারী জাহাজ
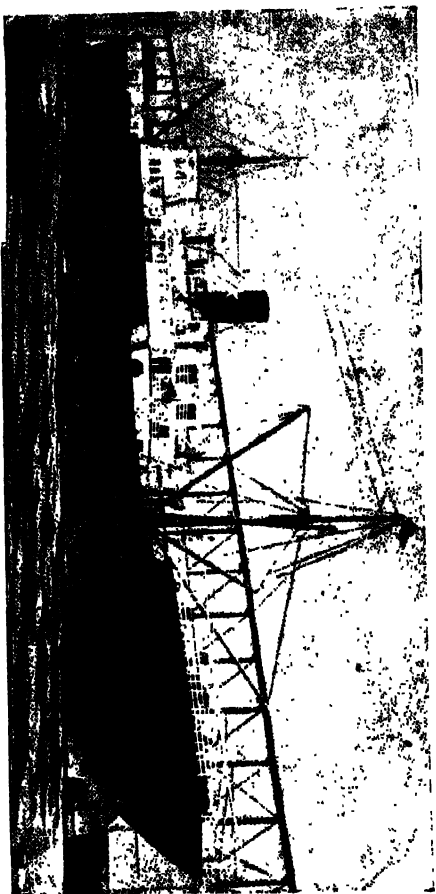
নাই। কাজেই এই সকল খনির মধ্যে যে কোনও প্রকার আলো ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাথর ভাঙ্গিবার জন্য পাথরের স্তূপে প্রথমে এক বা দুই ফুট লম্বা ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া তাহা ডিনামাইট (dynamite) বা বারুদ দ্বারা পূর্ণ করা হয়। উহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে অল্পক্ষণ পরেই
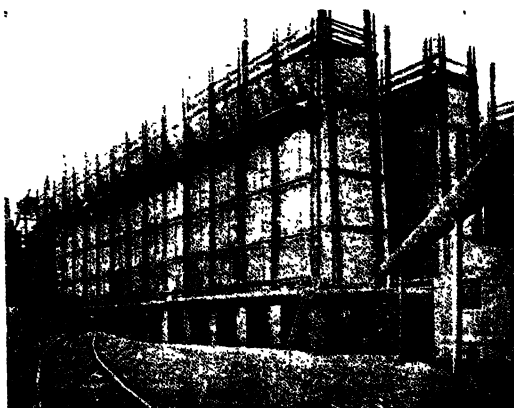
সেল তৈলের কারখানার দৃশ্য

ভীষণ শব্দে পাথরগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে। তখন ঐগুলি খনির মুখে (pit) লইয়া গিয়া উপরে তুলিয়া লওয়া হয়। পরে এই সকল পাথর কারখানায় লইয়া গিয়া পুনরায় কলের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট করা হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের টুক্‌রাগুলি একটি বড় লোহার পাত্রে পূর্ণ করিয়া

এবং তাহার মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া তাহাতে তাপ দেওয়া হয়। পাত্রের গায়ে একটি ছিদ্র থাকে। উত্তপ্ত পাথর হইতে যে বাষ্প ঐ ছিদ্র দিয়া বাহির হয়, তাহা একটি নলের সাহায্যে জলের মধ্যে দিয়া লইয়া যাইলে উহা হইতে প্রথমে সবুজ রঙের একপ্রকার তৈল (green oil) এবং হল্‌দে রঙের একপ্রকার জল পাওয়া যায়। এই জল হইতে আমরা 'সাল্‌ফেট অফ্ এমোনিয়া'-নামক উৎকৃষ্ট সার পাইয়া থাকি। অপরিষ্কার পেট্রোলিয়াম তৈল যেরূপ ভাবে পরিষ্কার করা যায়, ঠিক সেইরূপ ভাবে 'গ্রীন অয়েল' বা সবুজ তৈল পরিষ্কার করিলে আমরা উহা হইতে প্যারাফিন, ন্যাপথা প্রভৃতি পাই। তোমরা অনেকেই ব্রহ্মদেশের খনিজ তৈল হইতে প্রস্তুত বাতি দেখিয়া থাকিবে। উহা প্যারাফিন জমাইয়া প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ লোকে ভুলক্রমে উহাকে মোমবাতি বলিয়া থাকে। কয়লা হইতেও উপরোক্ত প্রথায় তৈল নিষ্কাশন করা যায়।

পারস্য, রুশিয়া, মেসোপটেমিয়া, কলম্বিয়া, আর্‌জেন্‌টাইন্, মেক্সিকো, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্, রুমানিয়া, বোর্ণিও, ব্রহ্মদেশ, আসাম প্রভৃতি স্থানে তৈলের খনি আছে, কিন্তু খনিজ তৈলের কথা মনে হইলেই সর্ব্বাগ্রে আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের কথাই মনে হয়। এই দেশের বহু লোকে তৈলের ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা এখন

পৃথিবীর মধ্যে খনিজ তৈলের রাজা। পরলোকগত দানবীর মিঃ জন রকফেলার কেরোসিন তৈলের ব্যবসায় করিয়া এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সমস্ত পৃথিবীতে প্রতি বৎসরে যত পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় ষাইট ভাগ ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে, তেইশ ভাগ কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী বাকুতে এবং বাকী সতর ভাগ মাত্র অন্যান্য সমস্ত দেশে পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে, কারণ কাঠ বা কয়লা অপেক্ষা অল্পস্থানে ইহা রাখা যায়। কাঠ বা কয়লার আগুন দিয়া মোটর-গাড়ী চালাইতে হইলে উহাতে রেল-ইঞ্জিনের মত কাঠ বা কয়লা রাখিবার স্থানের আবশ্যক হইত এবং এই সকল ভারী জিনিস বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য মোটর-গাড়ীর যাত্রী বা মাল বহিবার ক্ষমতা অনেক কমিয়া যাইত। তাহা ছাড়া তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির কয়লা-চালিত ইঞ্জিনগুলি সাধারণতঃ আকারে কত বড়! সুতরাং এইগুলির জন্য বেশী স্থানের আবশ্যক হয়। পেট্রোল দ্বারা চালিত ইঞ্জিনগুলি ছোট ও হাল্কা এবং স্বল্পপরিসর স্থানে ইহা রাখা যায়। তাহা ছাড়া কয়লা দ্বারা চালিত ইঞ্জিন বা কল যত শীঘ্র খারাপ হইয়া যায়, পেট্রোল-চালিত ইঞ্জিন তত শীঘ্র খারাপ হয় না। এইরূপ নানা কারণে কেবল মোটর-গাড়ী

কেন, উড়ো জাহাজ, রেলগাড়ী, ষ্টীমার, মোটর-বোট প্রভৃতি বহুপ্রকার যান পেট্রোল দ্বারা চালান হইতেছে। ইহা ছাড়া আজকাল অবস্থাপন্ন লোকে কেরোসিন তৈল বা পেট্রোল গ্যাস্ দ্বারা ষ্টোভে বা বৈজ্ঞানিক চুল্লীতে রান্না করিতেছেন, কারণ ইহাতে কয়লার মত ধূম নির্গত হয় না এবং ইহার উত্তাপ আবশ্যকমত বাড়ান বা কমান যায়। ডে-লাইট, পেট্রোমাক্স ইত্যাদি বহু প্রকার কেরোসিন-গ্যাসের আলো সুদূর পল্লীগ্রামের লোকেও আজকাল ব্যবহার করিতেছেন ; কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বেও লোকে জানিত না যে, এই তৈল মানুষের এত কাজে লাগিবে। আজ দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পেট্রোলিয়ামের কত আদর! ইহাকেও আমরা বিজ্ঞানের জয় বলিতে পারি।

কাপড়

সারা বৎসর—বিশেষতঃ পূজার সময়, বাঙ্গলার ছেলে-মেয়েদের রঙ্‌বেরঙের শাড়ী, কাপড়, জামা, সেমিজ প্রভৃতি চাই-ই। গরিব, বড়লোক ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সকলেই পূজার সময়ে আপন আপন অবস্থা ও রুচি অনুসারে নূতন কাপড়, জামা প্রভৃতি ক্রয় করেন। সুতরাং বাঙ্গলার জামা ও কাপড়ের দোকানগুলিতে পূজার সময় কি ভিড়! নূতন জামা ও কাপড় পাইয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কি আনন্দ! কত শত শ্রমিক ও শিল্পী রাত-দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সকলকে ঐ আনন্দ দিতেছেন, তাহা কেহ ভাবে কি? কথায় বলে—"ভাত-কাপড়ের অভাব না থাকিলে আর ভাবনা কি?" পরিধেয় বস্ত্র ও আহার আমাদের নিত্য চাই। এই সকল সুন্দর সুন্দর কাপড় কোথায়, কাহার দ্বারা এবং কিরূপ ভাবে প্রস্তুত হয়, তাহার সংবাদ কয়জনে রাখে? আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গলা-মায়ের প্রত্যেক সুসন্তানের পক্ষে উহার সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কাপড়, সূতা দিয়া প্রস্তুত হয়—তাহা সকলেই জানে। যে সকল জিনিসে মোলায়েম অথচ শক্ত আঁশ আছে, তাহা

পাকাইয়া সূতা প্রস্তুত হয়। রেশম, পশম, কার্পাস, পাট, ট্যাঁড়শ গাছের ছাল, আনারস, কোঙা প্রভৃতির পাতা ও অন্যান্য নানাপ্রকার দ্রব্য হইতে সূতা তৈয়ার করা যাইতে পারে। সুতরাং সূতার পার্থক্য অনুসারে—রেশমী, পশমী, সূতী এবং পাইন আপেল বা আনারসের পাতা হইতে প্রস্তুত শাড়ী, কাপড়—ইত্যাদি পাওয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার সূতার প্রস্তুত-প্রণালীতে কিছু কিছু প্রভেদ থাকিলেও বয়নপ্রণালী প্রায় সকল কাপড়েরই এক রকম। কাপড় বলিতে আমরা সাধারণতঃ কার্পাসতূলা হইতে প্রস্তুত কাপড়ের কথা মনে করি, কারণ তাহাই আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি। আজ আমরা এখানে কার্পাসতূলা হইতে কিরূপে কাপড় প্রস্তুত হয় তাহাই সংক্ষেপে বলিব।

আমাদের দেশের প্রায় সকল গ্রামেই কার্পাসগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্পাসগাছ নানাপ্রকারের—কোনগুলির পাতা বেশ বড় বড়, আবার কতকগুলির পাতা ছোট ; তবে ফলগুলি আকারে ছোট বা বড় হইলেও সকল রকমের ফলই পাকিলে ফাটিয়া যায় ও তাহার মধ্য হইতে শ্বেতবর্ণের তূলা বাহির হইয়া পড়ে। তোমরা যদি কার্পাসগাছ দেখিয়া থাক ত' উত্তম, আর না দেখিয়া থাকিলে চেষ্টা করিয়া দেখিয়া লইবে। বেশী দিনের কথা নহে—প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীরা, পরিধেয় বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল না। তখন বাঙ্গলার প্রত্যেক

গ্রামের উচ্চ জমিগুলিতে কৃষকেরা কার্পাসের চাষ করিত। এজন্য এখনও অনেক গ্রামের উচ্চ জমিগুলিকে 'কাপাস-ডাঙ্গা' বলে। পুনরায় যাহাতে বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে কার্পাসের চাষ হয়, তাহার চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য।

কার্পাস-ফলগুলি পাকিলে তূলার মধ্যে বীজ পাওয়া যায়। বর্ষার পূর্ব্বে সেই বীজ পুঁতিয়া দিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়; বর্ষা পড়িলে চারাগুলি সারিবদ্ধভাবে লাগান যাইতে পারে। একবারে জমিতে সারিবদ্ধভাবে বীজ পুঁতিয়া দেওয়াও চলিতে পারে। তাহার পর মধ্যে মধ্যে গাছ বাড়িবার সময় গোড়াগুলিতে জল ও বৃষ্টির বিশেষ আবশ্যক; কিন্তু ফলগুলি পাকিয়া গেলে প্রখর রৌদ্রের আবশ্যক, তখন আর বৃষ্টি না হওয়াই ভাল, কারণ তাহাতে তূলার ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ বর্ষায় গাছ লাগাইলে শীতকাল হইতে ফলগুলি পাকিতে আরম্ভ করে। কোনও কোনও প্রকারের কার্পাসগাছ দুই-তিন বৎসর থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না। ফল পাকিলে কার্পাস-ক্ষেত্রগুলি দূর হইতে অতি মনোরম দেখায়। মধ্যপ্রদেশ, বেরার, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে শত শত বিঘা জমিতে এখনও কার্পাসের চাষ হয়। পাকা ফলগুলি কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে এক-একটি করিয়া তুলিয়া লয়। ইহাতে অনেক সময় লাগে বলিয়া আমেরিকায় এইজন্য কলের ব্যবহার হয়।

ভারতীয় তূলার আঁশ ছোট। মিশর ও আমেরিকার

তূলা আমাদের দেশের তূলা অপেক্ষা ভাল। সমগ্র পৃথিবীতে যত তূলা জন্মে, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক আমেরিকার মিসিসিপি নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে পাওয়া যায়।

ফলগুলি সংগৃহীত হইলে তাহার মধ্য হইতে বীজ বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। পাঁচ মণ তূলার বীজ হাতে ছাড়াইয়া ফেলিতে একটি লোকের প্রায় এক বৎসর সময় লাগে; কিন্তু বীজ বাহির করিবার একটি কলে, দৈনিক প্রায় পনেরো হইতে পঁচাত্তর মণ তূলার বীজ বাহির করিয়া ফেলা হয়। সুতরাং এই কার্য্যের জন্য কলের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। এই বীজ হইতে তৈল, খইল প্রভৃতি পাওয়া যায়। প্রায় পাঁচ মণ বীজশূন্য তূলা একত্র কলের সাহায্যে চাপ দিয়া ছোট গাঁইট করা হয়। এই গাঁইটগুলি চট দিয়া মোড়াই করিয়া ও পাত্‌লা লোহার·পাত দিয়া বাঁধিয়া—সূতা এবং কাপড়ের কলে চালান দেওয়া হয়।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, কলের মজুরেরা আবশ্যকমত গাঁইটগুলি হাত দিয়া খুলিয়া লয়। ক্বচিৎ কখনও গাঁইটগুলি হাতের দ্বারা খোলা হইলেও তাহার জন্য কল আছে। সেই কলে গাঁইটগুলি খুলিয়া, জমাট তূলা আঁচড়াইয়া ও বাতাস দিয়া পরিষ্কৃত করা হয় বা পিঁজিয়া ফেলা হয়। সূতা প্রস্তুতের জন্য লম্বা আঁশযুক্ত তূলাই ভাল। সুতরাং তূলায় আঁশ কম থাকিলে কিংবা যেরূপ সূতা প্রস্তুত করিতে হইবে—

তাহার গুণের তারতম্য অনুসারে—অভিজ্ঞ কাট্‌নী বা কারিগরেরা বিভিন্নপ্রকারের তূলা একসঙ্গে মিশাইয়া লন। এক প্রকারের একস্তর তূলা দিয়া অপর একস্তর অন্য এক প্রকারের তূলা দেওয়া হয়। এইরূপে আবশ্যকমত পর পর বিভিন্ন রকমের তূলা সাজাইয়া লইয়া ঐগুলি কলের মুখে বিছাইয়া দেওয়া হয়। কলের অপর প্রান্তে এই তূলা, ওজন এবং আকারে সমান স্তররূপে বাহির হয়। তখন এই তূলায় ময়লা, মাটি, পাতা, কাঠি প্রভৃতি অপরিষ্কৃত জিনিস কিছুই থাকে না। শীতকালে ধূনরীরা কিরূপে তূলা ধূনিয়া লেপ প্রস্তুত করে তাহা সকলেই দেখিয়াছ। এই কল হইতে যে তূলা বাহির হয়, তাহা উৎকৃষ্ট রূপে ধূনা তূলার মত বোধ হয়। পরে সেইগুলিকে লম্বা লম্বা নরম দড়ির আকারে পরিণত করা হয়। তাহাকে তূলার পাঁজ বলে। বাজারে তূলার পাঁজ বিক্রয় হয়, অনেকে তাহা দেখিয়া থাকিবে। যাঁহারা খদ্দর প্রস্তুতের জন্য হাতের দ্বারা সূতা কাটেন, তাঁহারা অনেক সময় নিজেই তূলা পিঁজিয়া ও ধূনিয়া পাঁজ প্রস্তুত করেন।

এই পাঁজগুলি হইতে তকলী বা চরকার সাহায্যে আবশ্যকমত সরু বা মোটা সূতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সকলেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, চরকার চাকা একবার ঘুরিলে টাকু অনেকবার ঘোরে। বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিকেরা এক বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কল প্রস্তুত করিয়াছেন যে, কলের চাকা
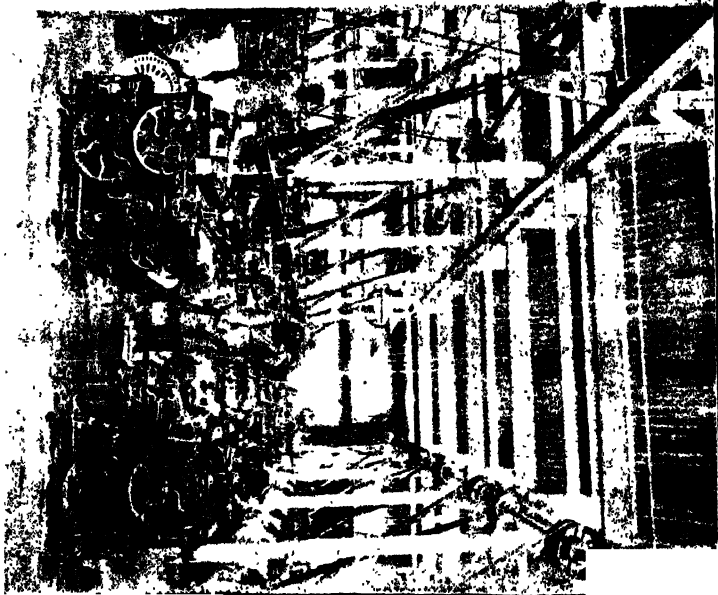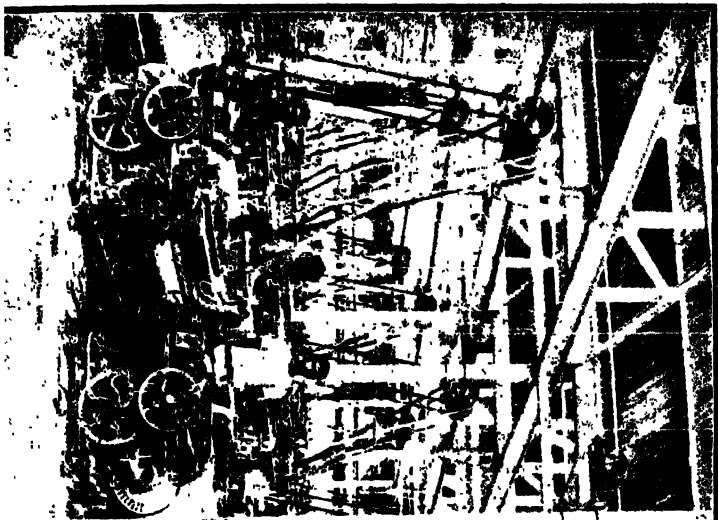
ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে শত শত টাকু একসঙ্গে চলিতে থাকে। কলে একজন অভিজ্ঞ কারিগর শত শত টাকুর কাজ দেখিয়া বেড়ান। কোনও কারণে কোনও টাকুর সূতা ছিঁড়িয়া গেলে সেই টাকুটির ঘোরা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া যায়। কারিগরের চক্ষু তীক্ষ্ণ ও কর্ণ সর্ব্বদা উৎকর্ণ হইয়া থাকে ; কলে সামান্য একটু দোষ ঘটিলে তিনি তৎক্ষণাৎ জানিতে পারেন এবং মেরামত করিয়া দেন। সূতা ছিঁড়িয়া গেলে, তিনি আবার উহা পাঁজের সহিত জুড়িয়া দেন। এইরূপে কলের সাহায্যে সূতা পাকান ও জড়ান একসঙ্গে হইয়া থাকে। এক-একটি নলীতে প্রায় দশ হাজার গজ সূতা জড়ান থাকে। মিহি বা মোটা অনুসারে সূতার নম্বর ধরিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। সাধারণতঃ আমাদের দেশে ৬০ নম্বর সূতা প্রস্তুত হয়। যদি সূতার কলের সহিত কাপড়ের কলও থাকে, তাহা হইলে, কলের জন্য আবশ্যকমত সূতা রাখিয়া, বাকী সূতা বাজারে বিক্রয়ের জন্য গাঁইট বাঁধিয়া চালান দেওয়া হয়। এক-একটি সূতার গাঁইটে চারি বা পাঁচমণ সূতা থাকে।

রঙীন পাড় বা রঙীন ছিট প্রস্তুতের জন্য সূতা অনেক সময় রঙ্ করিয়া লওয়া হয়। এক-একটি কলে এই কার্য্যের জন্য বহু স্ত্রীলোক নিযুক্ত আছে। এই স্থানে ইহা বলা আবশ্যক যে, সকল কলেই নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে ; তথায় পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্রে কাজ করে

না। যে বিভাগে অনেক পুরুষ কাজ করে, তথায় স্ত্রীলোক থাকে না। সুতরাং যে কাজ স্ত্রীলোকদিগের উপযুক্ত তাহা কেবল স্ত্রীলোক দ্বারাই করান হয়।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, নূতন কোরা কাপড়গুলিতে মাড় থাকে। মাড় দিলে সূতা শক্ত হয় ও বুনিবার সময় উহা সহজে ছিঁড়িয়া যায় না। ছেলেরা ঘুড়ির সূতা শক্ত করিবার জন্য উহা অনেক সময় মাড় বা আঠাযুক্ত নানাপ্রকার পদার্থ দিয়া মাজিয়া লয়। কলে মাড়ের সহিত চর্ব্বি, চীনামাটি, নীল রঙ্ এবং আরও নানাপ্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য মিশান হয়। সূতাগুলি প্রথমে বাষ্পের সাহায্যে বা জলে ভিজাইয়া লইয়া উহাতে মাড় মাখান হয়। মাড়ের সহিত নানাপ্রকার দ্রব্য মিশাইবার জন্য এবং ঐ মাড় সূতায় মাখাইবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ পাত্র থাকে। সেই সকল কার্য্যও কলের সাহায্যে করা হয়। যাহা হউক, এইরূপে সূতার পাইট হইয়া গেলে বা সূতা—কাপড় বুনিবার উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত হইলে—তাহাতে কাপড় প্রস্তুত হয়।

একখানি কাপড় একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায়, কতকগুলি সূতা লম্বালম্বিভাবে ও কতকগুলি আড়াআড়িভাবে আছে। যে সকল সূতা লম্বালম্বিভাবে থাকে, তাঁতীরা তাহাকে 'টানা' বলেন। কাপড় যত লম্বা হইবে, এই সূতাও তত লম্বা হইবে। টানার সূতা শাণার মধ্য দিয়া চালাইয়া
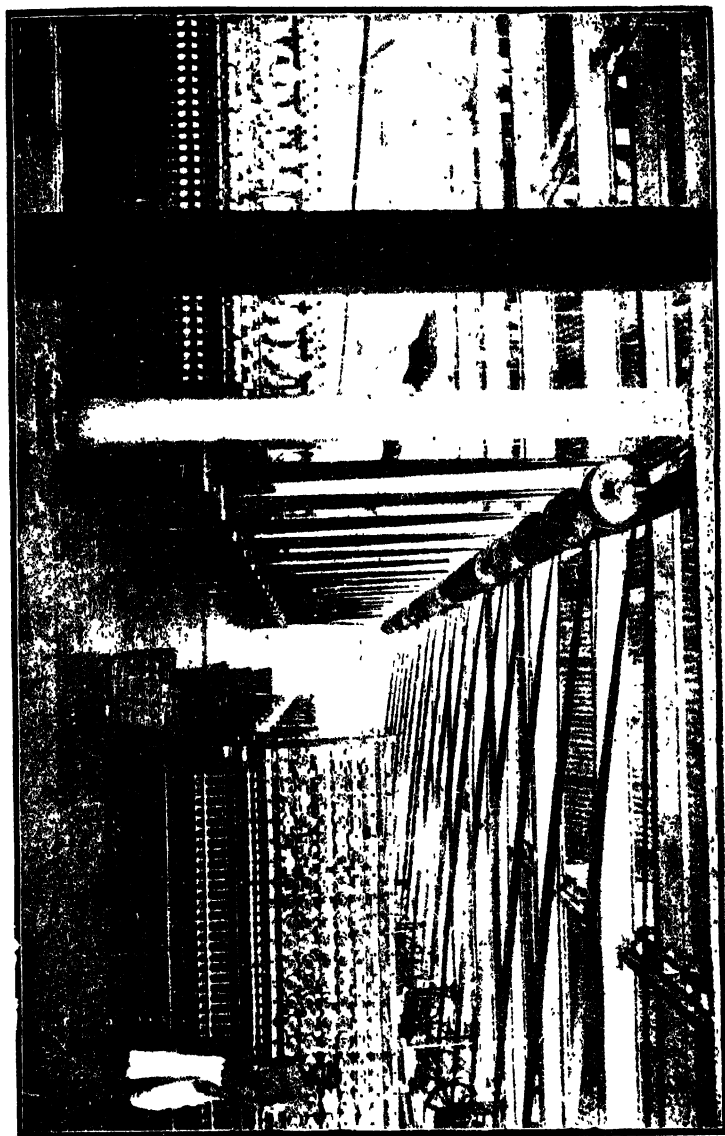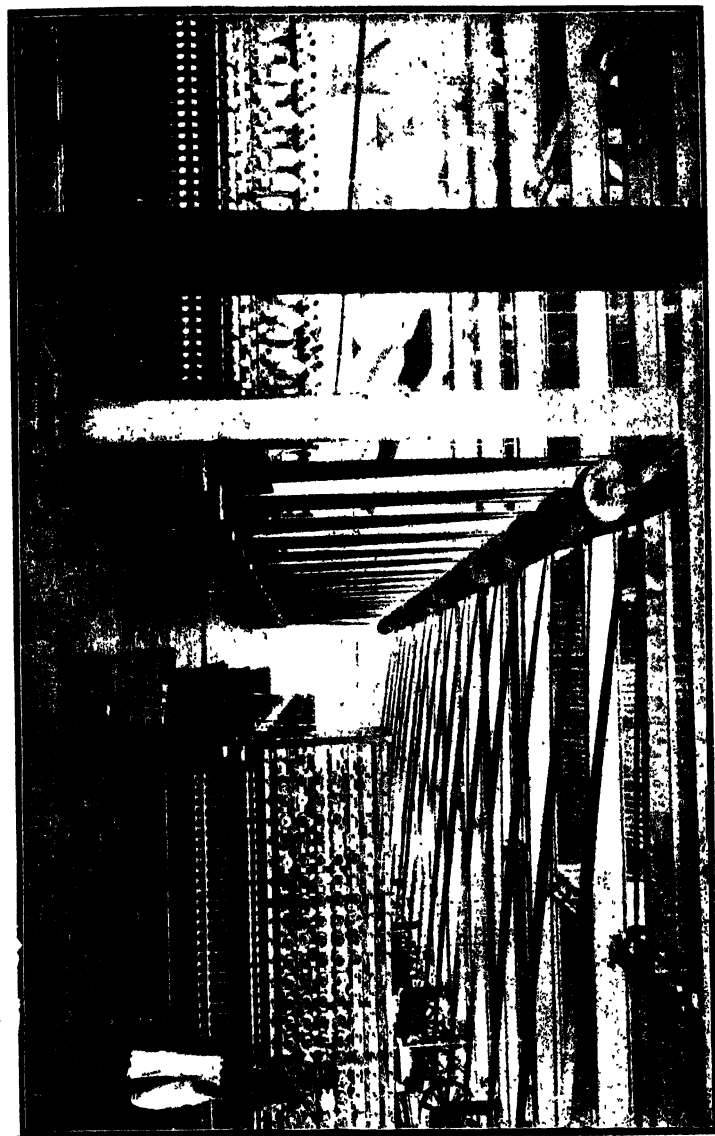
তাঁতীর মজুরী কাটা যায়। পরীক্ষার পর কাপড়ের গুণ এবং ওজন হিসাবে তাঁতীরা মজুরী পায়। এইরূপে এক-একটি তাঁতী মাসিক ২৫৲ হইতে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিতে পারে। হাত-তাঁত চালাইয়া অনেক তাঁতী মাসিক ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত অনায়াসে উপায় করিতে পারে।

পরীক্ষান্তে কাপড়গুলি দর্জীর নিকট পাঠান হয়। দর্জী এক জোড়া কাপড়ের আঁচলা বা প্রান্তভাগ অপর এক জোড়া কাপড়ের আঁচলার সহিত জুড়িয়া দেয়। এইরূপে পাঁচ বা ছয় শত গজ কাপড় একসঙ্গে জুড়িয়া ফেলিয়া উহা বাষ্পদ্বারা বা সামান্য সামান্য জলের ছিটাদ্বারা অল্প ভিজান হয় এবং উহাকে বড় বড় রোলারে জড়ান হয়। কলে, সঙ্গে সঙ্গেই এই কাপড় শুষ্ক ও ইস্ত্রী করিয়া ফেলা হয়। কোরা কাপড় এইরূপে সামান্য একটু পরিষ্কার ও মসৃণ হয়। ইস্ত্রী হইলে কাপড়-গুলির প্রান্ত হইতে সেলাই খুলিয়া, জোড়া জোড়া কাপড় ভাঁজ করিয়া উহার উপর মিলের ছাপ, কাপড়ের মাপ, নম্বর, ট্রেডমার্ক প্রভৃতি ছাপিয়া দেওয়া হয়। এই কার্য্য হস্তদ্বারা বা কলে হইতে পারে। এই সকল কাপড় বাজারের অর্ডার-মত কিংবা গুণ ও মাপ অনুসারে গাঁইট বাঁধা হয়। এক গাঁইট কাপড়ে সাধারণতঃ দুই শত জোড়া কাপড় থাকে। গাঁইট বাঁধাই কার্য্য কলেই হয়।

পাড় বা ছিটের জন্য সূতা রঙ্ করিবার কথা পূর্ব্বে বলা

হইয়াছে। কাপড় রঙ্ করিবার ব্যবস্থাও প্রায় প্রত্যেক মিলেই আছে। আবশ্যক হইলে কোরা কাপড় মিলে ধোলাই ও ইস্ত্রী করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল কার্য্যের জন্য নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যেরও ব্যবহার হয়।

বঙ্গদেশে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে। তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল, ঢাকার ঢাকেশ্বরী কটন মিল, কলিকাতার কেশোরাম কটন মিল ও বাসন্তী কটন মিল প্রধান। সম্প্রতি আরও নানা স্থানে কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। কারণ বাঙ্গালী যত কাপড় ব্যবহার করে, তাহার অতি অল্প সংখ্যাই বাঙ্গলাদেশে প্রস্তুত হয়। বোম্বাই, আমেদাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি সহরে বহু কাপড়ের কল আছে। সেই সকল অঞ্চলে কার্পাসের চাষ হয় বলিয়া অতিসহজে অল্প ভাড়া দিয়া প্রচুর ভারতীয় কার্পাস পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল স্থানের কলওয়ালাদিগকে বাঙ্গলা, বিহার কিংবা আফ্রিকা হইতে কল চালাইবার জন্য কয়লা খরিদ করিতে হয়।

বাঙ্গলার বায়ু অনেক সময় আর্দ্র থাকে বলিয়া ইহা সূতা ও কাপড় প্রস্তুতের পক্ষে ভাল। সেই কারণেই বিলাতে ম্যাঞ্চেষ্টার সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বাঙ্গলার অনেক স্থান কয়লার খনির নিকটবর্ত্তী বলিয়া এখানে কয়লার মূল্য কম। সুতরাং চেষ্টা করিলে

বঙ্গদেশে আরও অনেকগুলি কাপড়ের কল বেশ ভালভাবে চলিতে পারে।

শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী মাহেশের বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে প্রায় ২৪,০০০ টাকু ও ৭৩০টি তাঁতে দৈনিক ২০০ মণ সূতা ও পাঁচ-ছয় হাজার জোড়া কাপড় প্রস্তুত হয়। এই কল সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। এখানে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক দৈনিক দশ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিয়া গড়ে ॥৵০ হিসাবে রোজগার করে। পূজার বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য উঁহারা বৈশাখ মাস হইতে পূরাদমে কাজ চালান। মিলের ম্যানেজারের অনুমতি লইয়া যে কোনও দিন কলে তূলার বস্তা খোলা হইতে—কাপড়ের গাঁইট বাঁধা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বেশ শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক। এই মিলে যাইতে হইলে ই. আই. রেলের শ্রীরামপুর বা রিষড়া রেলষ্টেশনে নামা যাইতে পারে কিংবা হাওড়া হইতে বালী হইয়া মোটর-বাসে যাওয়া যায়। মিলটি ভাগীরথী বা হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত; সুতরাং নৌকা বা ষ্টীমার যোগেও এই স্থানে যাওয়া যাইতে পারে। কলিকাতার উপকণ্ঠে মাটিয়া-বুরুজে কেশোরাম কটন মিল ও গেঞ্জীর কল অবস্থিত।

বাঙ্গলাদেশের নানা স্থানে বিশেষতঃ শান্তিপুর, ফরাস-ডাঙ্গা, চন্দ্রকোণা, পাবনা, ঢাকা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানের তাঁতীরা সুন্দর সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করেন। সেই সকল

কাপড়ের চাহিদা বাঙ্গলায় যথেষ্ট আছে। কয়েক বৎসর হইতে

কলে কাপড় বোনা হইতেছে

হাতেকাটা সুতা হইতে প্রস্তুত খদ্দরের কাপড়, চাদর, ছিট

প্রভৃতির কাটতি উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাতে বহু লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে। আরও বহুলোক এই কার্য্যের দ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারে। বাঙ্গলার কৃষকগণ দুই-তিন মাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া প্রচুর ফসল পায় এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় অলসভাবে বসিয়া থাকে। সুতরাং কৃষকগণ যদি কার্পাসের চাষ করিয়া নিজগৃহে সূতা প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে নিজেদের কাপড়ের উপযোগী সূতা রাখিয়া দিয়া প্রতি বৎসরে সূতা বিক্রয় করিয়া তাঁহারা বেশ লাভবান্ হইতে পারেন। গরিব ও ভদ্র ঘরের মেয়েরা এবং নিষ্কর্ম্মা যুবকেরাও অনায়াসে এই কার্য্য করিতে পারেন; উহাতে লজ্জার কিছুই নাই। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী, নিজেকে তাঁতী বলিয়া পরিচয় দিতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ করেন না। তাঁতীর কার্য্য হেয়—ইহা কোনও প্রকারেই বলা যায় না; বরং উহা ভারতবাসীর বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পশম

শীতকালে অনেকেই পশমী বস্ত্র ব্যবহার করেন। মেয়েরা উল দিয়া টুপী, মোজা, গলাবন্ধ প্রভৃতি বুনেন। আজকাল-কার কথা নহে, বহু প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে পশমের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুদিগের ধারণা যে পশমী বস্ত্র বিশুদ্ধ, সুতরাং পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতি করিবার সময় অনেকে পশমী বস্ত্র পরিধান করেন। বাইবেল ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থেও পশমের উল্লেখ আছে। প্রাচীন রোমকেরা যে পশম ব্যবহার করিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বহুকাল হইতে পশমের জন্য মানবজাতি মেষ পালন করিয়া আসিতেছে ও মেষপালকদিগের সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প সকল দেশেই শুনিতে পাওয়া যায়।

পশম যে কেবল ভেড়ার লোম হইতেই হয় তাহা নহে। ছাগল, উষ্ট্র, দুম্বা, আলপাকা, কালো হরিণ, কুকুর প্রভৃতি নানা-প্রকার প্রাণীর লোম হইতেও পশম পাওয়া যায়। তবে বেশীর ভাগ পশম ভেড়ার লোম হইতেই পাওয়া যায়। ভেড়া সকল দেশেই আছে; কিন্তু সকল ভেড়ার লোম একপ্রকারের

নহে। কতকগুলি ভেড়ার লোম লম্বা আর কাহারও বা ছোট। ভেড়ার দেহের দুই পার্শ্বে ও স্কন্ধে যে লোম হয় তাহা গলা ও মস্তকের লোম অপেক্ষা ভাল। স্পেন ও অষ্ট্রেলিয়ার মেরিণো নামক ভেড়া হইতে এবং স্কট্‌লণ্ডের কালোমুখওয়ালা ভেড়া হইতে উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যায়। এশিয়া-মাইনর ও কাশ্মীরে যে সকল ছাগল পাহাড়ে চরিয়া বেড়ায়, তাহাদিগের দেহ আট-নয় ইঞ্চি লম্বা রেশমের মত সাদা পশমে আবৃত।

শীত ও বসন্তে ভেড়ার লোম বড় হয়। গরম পড়িলে লোম কাটিবার পূর্ব্বে ভেড়াগুলির দেহ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া দেওয়া হয়। অষ্ট্রেলিয়ার মেষপালন-ক্ষেত্র-সমূহে লক্ষ লক্ষ ভেড়া প্রতিপালিত হয়। সুতরাং এই কার্য্য তথায় কলের সাহায্যে করা হয়। একস্থানে অনবরত বৃষ্টির মত জল পড়িতেছে। ভেড়াগুলিকে সেইস্থানে ছাড়িয়া দিয়া কৃত্রিম বৃষ্টির জলে বা 'শাওয়ার বাথে' (shower bath) উত্তমরূপে স্নান করান হয়। পরে তাহাদিগকে সাঁতার কাটিবার জন্য দুই-তিনটি বড় বড় চৌবাচ্চায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কোনও কোনও চৌবাচ্চায় সাবান-মিশ্রিত জল থাকে। অনেক স্থানে ইহার জন্য ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা আছে। এই কাজের জন্য আবশ্যকমত ইঞ্জিন, পাম্প প্রভৃতির সাহায্য লওয়া হয়।

ভেড়ার দেহ পরিষ্কার হইলে লোমের চাক্‌চিক্য অনেক কমিয়া যায়। এইজন্য ও লোমগুলি বেশ শুষ্ক করিবার উদ্দেশ্যে —স্নানের দুই-এক সপ্তাহ পরে লোম কাটা হয়। লোম কাটিবার

কলে লোম কাটা হইতেছে

জন্যও আজকাল কলের ব্যবহার হইতেছে। সাধারণতঃ লোম কাটিবার পূর্ব্বে একটি লোক দুই পায়ের মধ্যে একটি ভেড়াকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া তাহাকে চাপিয়া ধরে ও তাহার লোম

কাটিয়া লয়। মাথা ও গলার লোম কাটিয়া পৃথক্ পৃথক্-ভাবে রাখে। পরে তাহা দড়ি দিয়া বাণ্ডিলের মত করিয়া বাঁধিয়া চালান দেয়। এক-একটি ভেড়া হইতে চারি সের বা সাড়ে চারি সের পর্য্যন্ত লোম পাওয়া যায় এবং উহা লম্বায় দশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়।

লোমগুলি কারখানায় পঁহুছিলে প্রথমেই উহার শ্রেণী বিভাগ হয়। কোনও কোনও কারখানায় উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হিসাবে লোমগুলি তের-চৌদ্দটি পর্য্যন্ত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সাধারণ লোকে দেখিলে পশমের পার্থক্য আদৌ বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু অভিজ্ঞ বাছাইদারেরা হাত দেওয়া মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, উহা কোন্ শ্রেণীর পশম। এই কার্য্য অনেক সময় বিপজ্জনক, কারণ অনেক ভেড়া "আনথ্রাক্স" (anthrax) নামক রোগে মারা যায়। এই রোগের বীজাণু লোমের মধ্যে থাকিলে এবং উহা কোনও প্রকারে মনুষ্য-দেহে সংক্রমিত হইলে ভীষণ পীড়া হইতে পারে। সুতরাং অসুস্থ বা মৃত ভেড়ার পশম বিক্রয় করিলে আজকাল আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করায় আজকাল বাছাইদারদিগের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বাছাই কার্য্য শেষ হইলে পশমগুলি সাবান ও আমোনিয়া (ammonia) মিশ্রিত জলে উত্তমরূপে ধৌত করা হয়।

ভেড়াগুলিকে স্নান করাইলে লোম কিছু পরিষ্কৃত হইলেও উহাতে বহু দিনের সঞ্চিত ময়লা, মাটি, চিট প্রভৃতি থাকে। পশম উত্তমরূপে পরিষ্কৃত না হইলে ইহা দ্বারা বয়ন-কার্য্য ভাল

কলে পশম পরিষ্কার করা হইতেছে

হয় না। সুতরাং কিছুক্ষণ সাবান-মিশ্রিত-জলপূর্ণ একটি চৌবাচ্চায় পশমগুলি ফেলিয়া দিয়া উহা কোনও বৃহৎ যষ্টি বা যন্ত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ একধার হইতে আর একধারে লইয়া

যাওয়া হয়। পরে ঐগুলি জল হইতে তুলিয়া উহার উপর রোলারের (Roller) চাপ দেওয়া হয়। ময়লা জল বাহির হইয়া গেলে উহা শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। এইরূপে পরিষ্কার করিবার ফলে এক মণ ওজনের পশম অনেক সময় চব্বিশ বা পঁচিশ সেরে দাঁড়ায়। পশম পরিষ্কৃত ও শুষ্ক করিবার কাজ অনেক কারখানায় কলের সাহায্যে করা হয়।

তাহার পর এই পরিষ্কৃত পশম চিরুণী দ্বারা আঁচড়াইয়া লোমগুলি পৃথক্ করা হয়। এইজন্য লোমগুলিকে প্রথমতঃ তৈল মাখাইয়া মোলায়েম করা হয়। এই কার্য্যের জন্য সাধারণতঃ জলপাইএর তৈলই (olive oil) ব্যবহৃত হয়। চিরুণীগুলি সাধারণ চিরুণীর মত নহে। উহাতে বড় বড় দাঁত থাকে। কোনও কোনও কলে ছোট ও বড় দাঁতওয়ালা চিরুণী থাকে ও এক-একটা চিরুণীতে লক্ষ লক্ষ দাঁত থাকে। দুই-তিনবার আঁচড়াইবার পর যখন কল-ঘর হইতে পশম বাহির করা হয়, তখন উহার রঙ্ সুন্দর সাদা ধব্ধবে হয়। পরে এইগুলি রোলার ও অন্যান্য যন্ত্র-সাহায্যে লম্বালম্বিভাবে ছোট ছোট ভাগ করে। তখন উহা সূতা কাটিবার উপযুক্ত হয়।

তূলা হইতে সূতা প্রস্তুতের মত চরকার সাহায্যে পাক দিয়া পশমী সূতা ও উল প্রস্তুত হয়। পরে উহা হইতে গায়ের কাপড়, থান, কম্বল, দড়ি, মাথাবাঁধা ফিতা, পট্টু, প্রভৃতি নানাপ্রকার জিনিস প্রস্তুত হয়। বুনিবার পর পশমী

কাপড় খস্‌খসে থাকে। এইজন্য অনেকবার বেশ ভাল করিয়া সাবান-মিশ্রিত জলে কাপড়গুলি ধুইয়া ঘাস কাটিবার কলের মত একপ্রকার কলের সাহায্যে, কাপড়ের উপর যে সকল লোম বাহির হইয়া থাকে তাহা কাটিয়া ফেলা হয়। পরে ইস্ত্রি করিলে সেই কাপড় ব্যবহারের উপযুক্ত হয়।

অনেক সময় পরিষ্কৃত পশম বা সূতায় রোলারের চাপ দিয়া জমাট বাঁধিয়া একপ্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়; উহাকে 'ফেল্ট' বলে। চীনারা পশম জমাইয়া একপ্রকার জুতার তলা তৈয়ারী করে। উহা বেশ মজবুত ও উহাতে পা গরম রাখে।

এশিয়া-মাইনরে একটি সহরের নাম এঙ্গোরা। এই দেশের ছাগলের লোম হইতে প্রস্তুত কাপড়কে 'মোহেরার' বলে। সেইরূপ তিব্বত ও কাশ্মীরের ছাগলের লোম হইতে প্রস্তুত কাপড়কে 'শাল' বলে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশের আলপাকা নামক প্রাণীর লোম ও রেশম মিশ্রিত কাপড়কে 'আলপাকা' বলে। সাধারণ পশমী বস্ত্র অপেক্ষা আলপাকার চাক্‌চিক্য অধিক। বাছাই-করা বড় লোম দ্বারা 'ওয়ারষ্টেড' নামক কাপড় প্রস্তুত হয়। ইংলণ্ডের ওয়ারষ্টেড নামক সহরে এই কাপড় বেশী প্রস্তুত হয় বলিয়া সহরের নাম অনুসারে কাপড়ের নাম হইয়াছে। মেরিণো কাপড়—মেরিণো ভেড়ার লোম হইতে প্রস্তুত। এইরূপ পারস্য দেশের কির্ম্মাণ প্রদেশজাত কির্ম্মাণী পশম হইতে, আফগানী ছাগলের পুৎ'

নামক পশম হইতে, চীন ও তাতার দেশের কুকুরের লোম হইতে, চমরী গাই, কালো হরিণ, উট প্রভৃতি নানাপ্রকার জন্তুর পশম হইতে বিভিন্ন প্রকারের পশমী কাপড় প্রস্তুত হয়।

আমাদের দেশে বাঙ্গলা, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের কৃষকেরা যত্নের সহিত মেষ পালন করিয়া থাকে। কারণ ইহার লাদি বা মল হইতে উৎকৃষ্ট সার হয়। তাহা ছাড়া 'যুগী' ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহার লোম ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। আজকাল বড় বড় সহরের পাইকারেরা পল্লীগ্রাম হইতে ভেড়া কিনিয়া দেশ-বিদেশে চালান দিতেছে। বাঙ্গলার নানাস্থানে কম্বল, আসন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা হয় না বলিয়া উহা অনেক সময় খস্‌খসে হইয়া থাকে। আমাদের দেশ হইতে পশম বিদেশে চালান হইয়া গিয়া তাহার সহিত পাট প্রভৃতি মিশাইয়া রঙীন নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর বস্ত্র, কম্বল, গায়ের কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ বাজারে যে সকল কাপড় দেশী বলিয়া বিক্রীত হয় তাহার অধিকাংশই বিদেশী, কেবল পাড়টি এখানে লাগান হইয়াছে বা নক্সার কার্য্য এখানে করা হইয়াছে। অমৃতসহর, জালালপুর, রামপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁতের সাহায্যে কিছু কিছু পশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়; কিন্তু বাজারের চাহিদার তুলনায় তাহা অতি অল্প। তাহা ছাড়া, ঐগুলি মূল্যবান বলিয়া সাধারণ লোকে ব্যবহার করিতে

পারে না। পশম বয়ন-কার্য্যে এই দেশের আরও বহু লোক প্রতিপালিত হইতে পারে। কাণপুর, লুধিয়ানা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি কল আছে। ঐ সকল কলে বহু ভারতীয় শ্রমিক কাজ করে, কিন্তু উহার বেশীর ভাগ মূলধনই বিদেশী।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, ভেড়া প্রায় সকল দেশেই পাওয়া যায়; কিন্তু ভেড়া ও পশমের ব্যবসায়ে আজকাল

অষ্ট্রেলিয়ার মেষচারণ-ভূমি

অষ্ট্রেলিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ফিলিপ্‌স্‌ নামক এক ভদ্রলোক মাত্র ঊনত্রিশটি ভেড়া ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় চালান দেন। ইহাই সে-দেশে প্রথম ভেড়ার আমদানী। আজ সেখানে লক্ষ লক্ষ ভেড়া দেখিতে পাওয়া যায় ও পশমের ব্যবসায়ে সে-দেশের বহু লোক

লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার ভেড়া প্রতিপালনের প্রধান অসুবিধা এই যে গ্রীষ্ম ছাড়া অন্যান্য ঋতুতে যথেষ্ট ঘাস ও জল তথায় পাওয়া যাইলেও গ্রীষ্মকালে এক এক বৎসর খুব জলকষ্ট হয়। তখন অনেক ভেড়া পিপাসার্ত্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত মারা যায়। এইজন্য এখন নানাস্থানে কূপ, নলকূপ, খাল প্রভৃতি খনন করা হইয়াছে। কোনও কোনও মেষ-পালন-ক্ষেত্রে পাম্প ও নলের সাহায্যে বহু দূর হইতে জল সরবরাহ করা হয়। অষ্ট্রেলিয়ার মেষপালকেরা ঘোড়ায় চড়িয়া সুবিশাল ক্ষেত্রস্থিত মেষসমূহের তত্ত্বাবধান করেন ও শিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে মেষগুলিকে মেষ-শালায় একত্রিত করেন।

নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আরজেনটাইন, যুক্তরাজ্য ও গ্রেট-ব্রিটেনেও ভাল পশম পাওয়া যায়। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলের পশম ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের পশম অপেক্ষা ভাল। চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ক্ষুদ্র বা বৃহদাকারে ছাগল, গরু প্রভৃতির সহিত মেষ পালন করা যাইতে পারে।

কাগজ

আজকাল লিখিবার জন্য আমরা কলে প্রস্তুত কাগজ সচরাচর ব্যবহার করি ; কিন্তু প্রাচীনকালে—কাগজ আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে—লোকে পাথর, কাঠ, ইট, পিতল, তামা, পাতা, গাছের ছাল, চামড়া প্রভৃতিতে লিখিত। কাগজের আবিষ্কার প্রথমে কোথায় হয় ইহা লইয়া বিভিন্ন মত আছে। অনেকে মনে করেন যে, প্রায় ৯৫ খৃষ্টাব্দে চীনারা বাঁশ, তূলা, গাছের ছাল প্রভৃতি হইতে মণ্ড তৈয়ার করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিত। গ্রীকবীর আলেকজান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন এদেশের লোকে 'জমাট তূলায়' হিসাব রাখিত ও দলিলাদি লিখিত। বাঁশ হইতে চীনারাই প্রথমে কাগজ প্রস্তুত করে। প্রথমে তাহারা বাঁশগুলি জলে ভিজাইয়া রাখিত। উহার মধ্যে উত্তমরূপে জল প্রবেশ করিলে উহা চিরিয়া চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিত। ইহাতে বাঁশগুলি গলিয়া কাদার মত হইলে উহা উদূখলে কুটিত। পরে এই মণ্ড জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁচে ঢালিয়া শুষ্ক করিত। পূর্ব্বে আমাদের দেশে 'কাগজিয়ারা' অনেকটা এই উপায়ে ছেঁড়া কাপড়, ঘাস প্রভৃতি হইতে কাগজ প্রস্তুত করিত। নেপালে বাঁশ হইতে ও ভূটানে 'ডিয়া' নামক গাছের ছাল হইতে এখনও কাগজ প্রস্তুত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত। আমীর-ওমরাহদের ব্যবহারের জন্য যে কাগজ প্রস্তুত

হইত তাহা বেশ মূল্যবান, তাহাতে রূপালি বা সোণালি ছিটা দেওয়া থাকিত। এখনও কোনও কোনও স্বাধীন বা করদমিত্ররাজ্যে এই কাগজের অল্প অল্প প্রচলন আছে। পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইত, কিন্তু কলের কাগজের প্রচলন বেশী হওয়ায় হাতের তৈয়ারী কাগজের ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। কাজেই কাগজিয়ারা অনেকেই অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে।

কাগজের কলে ঘাস, বাঁশ, কাঠ, ছেঁড়া নেকড়া প্রভৃতি বাছাই করা, কাঠ সিদ্ধ করা, মণ্ড করা, পরিষ্কার করা, ধৌত করা, ছাঁচে ঢালা, শুষ্ক করা, মাপ-মত কাটা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। কাগজ আমরা নিত্য ব্যবহার করি, সুতরাং ইহা কি প্রকারে প্রস্তুত হয় ইহা জানা সকলের পক্ষেই ভাল। এখানে সংক্ষেপে ঘাস হইতে কাগজ প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করিব।

সাবুই বা বাবুই ঘাসের বোঝা বা বাণ্ডিল খুলিয়া প্রথমেই তাহা হইতে শক্ত কাঠি, কাঠের টুকরা প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই কার্য্য সাধারণতঃ কতকগুলি স্ত্রীলোক হাতের দ্বারা করে। তাহার পর এই ঘাসগুলি কলের মধ্যে দিয়া আঁচড়াইয়া পৃথক্ পৃথক্ করা হয় ও জোর হাওয়া দিয়া ইহার ধূলা মাটি প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়। ইংরাজীতে

এই যন্ত্রকে willow and duster বলে। এই কল হইতে ঘাসগুলি বড় ও মোটা নলের ভিতর দিয়া সিদ্ধ করিবার যন্ত্র boiler বা digester-এর নিকট লইয়া গিয়া ফেলা হয়। সেখানে ঘাস ওজন করিয়া digester-এ দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এক-একটি সিদ্ধ ও পরিপাক করিবার যন্ত্রে (digester) বা হাঁড়িতে ৭০ মণ ঘাস, পরিমাণমত ক্ষার বা caustic soda ও জল দেওয়া হয়। তাহার পর উহার মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া বাষ্প বা অগ্নির উত্তাপে তাহা গরম করা হয়। কোনও জলপূর্ণ পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া উহা গরম করিলে তাহার উত্তাপ খুব বেশী হয়—তাহা তোমরা অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। এইরূপে digester বা হাঁড়ির ভিতরের উত্তাপ ৩০০ ডিগ্রী বা তাহারও বেশী হয়। ঘাসগুলি প্রায় সাত-আট ঘণ্টা সিদ্ধ হইবার পর সাদা খস্‌খসে পদার্থের মত হইয়া যায়। তখন উহা দেখিতে অনেকটা ভিজা শণ বা পাটের মত হয়। সেই সময় উহাকে উত্তমরূপে ধুইয়া potcher নামক যন্ত্রে কুটা ও পেষা হয়। তখন সেগুলি ভিজা তূলার মত জলে ভাসিতে থাকে। উহার সহিত ক্লোরিন বা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশাইয়া উহাকে সাদা ধব্‌ধবে করা হয়। এই মণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হইলে কোনও স্থান মোটা—কোনও স্থান পাত্‌লা হইবে ও কাগজে নানাপ্রকার অপরিষ্কার জিনিসের কুটা থাকিবে, সুতরাং ইহা কাগজ প্রস্তুতের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। এইজন্য ইংরাজীতে

ইহাকে half-stuff বলে। সুতরাং strainer ও beater নামক যন্ত্রে আঁশগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জলের সহিত মিশাইয়া সূক্ষ্ম জালের মধ্য দিয়া অপরিষ্কার জিনিস বাছিয়া ফেলা হয় ও ইহা আবার ভালরূপে পেষা ও মিশান হয়। এইরূপ মণ্ডকে ইংরাজীতে whole stuff বলে।

এই মণ্ডে কাগজ প্রস্তুত করিলে ব্লটিং কাগজ প্রস্তুত হইবে। ব্লটিং কাগজে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, তাহাতে কালী চুষিয়া নেয়। সুতরাং লিখিবার কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে আঠাযুক্ত পদার্থ (starch), চীনা মাটি, চূণ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি এই মণ্ডের সহিত মিশান হয়। ইহাতে কাগজ মসৃণ ও পুরু হয়। কাগজ সাধারণতঃ ওজন দরে বিক্রয় হয়, এইজন্য কখনও কখনও কাগজ ভারী করিবার জন্য পরিমাণ অপেক্ষা বেশী চীনা মাটি দেওয়া হয়। তখন ইহাকে ভেজাল বলা চলে।

এই মিশ্রিত মণ্ড উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া জলের সহিত বেশ ভালভাবে মিশান হয় ও তরল অবস্থায় পাত্‌লা লোহার পাতের উপর দিয়া ধীরে ধীরে লইয়া যাওয়া হয়। এইসময়ে যন্ত্রের সাহায্যে কাগজ মোটা বা পাত্‌লা করা হয় ও কাগজের ভিতরে যে জল-ছাপ বা ট্রেডমার্ক থাকে তাহাও দেওয়া হয়। যখন এই তরল পদার্থ ধীরে ধীরে পাতের উপর দিয়া যাইতে থাকে, তখন উহা উত্তাপের সাহায্যে কিছু শুষ্ক হয়। পুনরায় এই তরল পদার্থ ফেল্ট বা পশমী কাপড় জড়ান রোলারের

উপর দিয়া লইয়া গিয়া শুষ্ক করা হয়। এই সময় উত্তাপে উহা শুষ্ক হইয়া কাগজ হইয়া যায় ও কলের এক প্রান্তস্থিত রোলারে জড়ান হইতে থাকে। কাগজের কলে এইরূপে ২৪ ঘণ্টা কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। এই কাগজ জড়ান রোলার ক্রেন বা কপিকলের সাহায্যে স্থানান্তরিত করিয়া সাইজ-মত কাটা হয় এবং দিস্তা রীম প্রভৃতিরূপে প্যাক হইয়া দেশ-বিদেশে চালান যায়। রঙীন কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে beater-এ মণ্ডের সহিত রঙ্ মিশাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে ঘাস হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে ২৪ ঘণ্টা বা তাহারও বেশী সময় লাগে। কাগজের অর্ডার অনুসারে—কখনও কখনও ঘাসের মণ্ডের সহিত কাষ্ঠের মণ্ড বা wood pulp মিশান হয়। Wood pulp আমেরিকা, সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে চালান হইয়া ভারতে আসে। এদেশে বহু প্রকার কাষ্ঠ থাকিলেও সেগুলি নাকি কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী নহে। এই বিষয়ে উদ্যমশীল ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদিগের অনুসন্ধান করা উচিত। কাগজ প্রস্তুতের প্রধান উপকরণ হইতেছে সেলুলোজ (cellulose) বা একপ্রকার আঠাযুক্ত পদার্থ। যে জিনিসে এই পদার্থ যত বেশী আছে তাহা কাগজ প্রস্তুতের তত উপযোগী। যাহা হউক, উপরি-উক্ত উপায়ে তূলা, বাঁশ, শণ, রেশম, পশম, খড়, কাষ্ঠ, করাতের গুঁড়া, ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতি হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

কাজের কথা

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী টিটাগড়, কাঁকিনাড়া প্রভৃতি স্থানে বাবুই ঘাস, বাঁশ প্রভৃতি হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। টিটাগড়ের কাগজের কল ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; ইহাতে দৈনিক প্রায় ৩২ টন কাগজ প্রস্তুত হয়। এই কল ২৪ ঘণ্টা চলিতেছে। মিলের ম্যানেজারের নিকট বা উহাদের কলিকাতার আফিসে আবেদন করিলে যে কোন সময়ে কাগজ প্রস্তুতপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। এই কলে ব্যবহৃত মোটামুটি রাসায়নিক দ্রব্যাদিও এখানে প্রস্তুত হয়। টিটাগড়ে সাবুই বা বাবুই ঘাস হইতে এবং কাঁকিনাড়ায় বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। বাবুই ঘাস সকল সময়ে পাওয়া যায় না। শীতের শেষে এই ঘাস কাটা হয়। সুতরাং এইসময়ে সাহারণপুর ও বিহারের নানাস্থান হইতে প্রচুরপরিমাণে বাবুই ঘাস আমদানী করিয়া গুদামজাত করা হয়। পরে উহা আবশ্যকমত ব্যবহার করা হয়। এই সকল কলে দেশীয় উপাদানে ও ভারতীয় শ্রমিক দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইলেও ইহার কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণ ইউরোপীয় বণিক ও কর্ম্মচারীদিগের হাতে।

আমাদের আবশ্যকীয় সমস্ত কাগজ এদেশে প্রস্তুত হয় না; সুতরাং অনেক কাগজ বিদেশ হইতে আসে। চেষ্টা করিলে ভারতের নানাস্থানে আরও কাগজের কল চলিতে পারে।

মাছ

মাছ-ভাত পাইলে বাঙ্গালী বড় খুশী। অধিকাংশ বাঙ্গালীর একটি প্রিয়খাদ্য—মাছ। বাঙ্গলার নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতিতে রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, তপ্‌সে, ভোলা, চিংড়ী, পুঁটী, মৌরুলা, চাঁদা, কৈ, মাগুর, শোল, শিঙ্গী প্রভৃতি ছোট ও বড় কত রকমের মাছ পাওয়া যায়। তোমরা পড়িয়া থাকিবে যে, পৃথিবীর তিনভাগ জল, আর একভাগ স্থল। বিভিন্ন দেশের জলাশয় সমূহে—বিশেষতঃ সাগরে, কত প্রকার মাছ যে আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সকল মাছ সকল স্থানে পাওয়া যায় না। পুকুরে বা নদীতে যে সকল মাছ পাওয়া যায় তাহার অনেকগুলি সাগরের লোণা জলে পাওয়া যায় না। আবার সাগরের মধ্যে গভীর জলে যে সকল মাছ থাকে তাহারা সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে—যেখানে অল্প জল থাকে—সেখানে থাকে না। কতকগুলি সাগরের মাছ প্রতি বৎসর মোহানা দিয়া নদীসমূহে প্রবেশ করে। এই সকল মাছ দক্ষিণ বঙ্গে পাওয়া যায়। কলিকাতায় সামুদ্রিক মাছ কিছু কিছু আমদানী হইলেও বাঙ্গলার অধিকাংশ স্থানে সামুদ্রিক মাছ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাজের কথা

সকল প্রকার মাছ দেখিতে এক রকমের নহে। অধিকাংশ মাছের গায়ে আঁইশ আছে। আঁইশগুলি দেখিতে চক্‌চকে ও কত সুন্দর! মাছের গা লালাবৎ পদার্থে পূর্ণ। প্রায় সকল মাছের মধ্যভাগ মোটা, মাথা ও লেজের দিক সরু। দেহের এইরূপ গঠন হওয়ায় মাছ সহজে সাঁতার কাটিতে পারে। মানুষ মাছের আকার দেখিয়া জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি অনেকটা
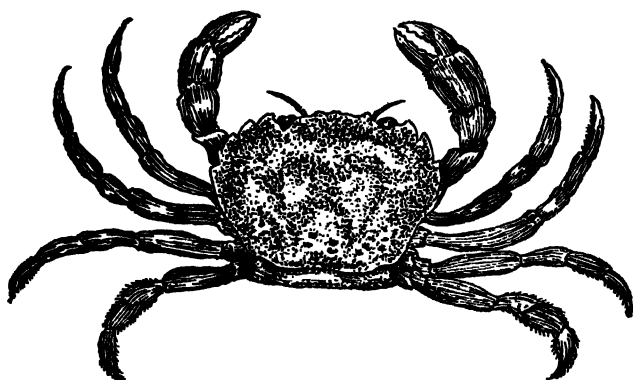
কাঁকড়া

ঐরূপভাবে গঠন করিয়াছে। মাছ পাখ্‌না বা ডানা দ্বারা জলে সাঁতার কাটে,—ইহাই তাহার দাঁড়ের কাজ করে। আর লেজটি তাহাদের হা'ল। লেজ ঘুরাইয়া মাছ যেদিকে ইচ্ছা যাইতে পারে। মাছের মাথায় নাকের ও কানের ছোট ছোট ছিদ্র থাকিলেও উহারা নাকের ছিদ্র দ্বারা জলের বিশুদ্ধতা

পরীক্ষা করে মাত্র ;—কান্‌কো ও মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করে। মাছের মস্তিষ্কের উপরের হাড়টি চামড়া দিয়া ঢাকা,—উহার উপর আঁইশ নাই। মাছের দুইটি চোখ আছে, কিন্তু চোখের পাতা না থাকায় মাছ সর্ব্বদা চোখ মেলিয়া থাকে ; ঘুমাইবার সময়েও চোখ মেলিয়া ঘুমায়। মাছের মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত একটি লম্বা শিরদাঁড়া আছে। এই শিরদাঁড়া—কাঁটাগুলি সমেত—মানুষ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতির শিরদাঁড়ার
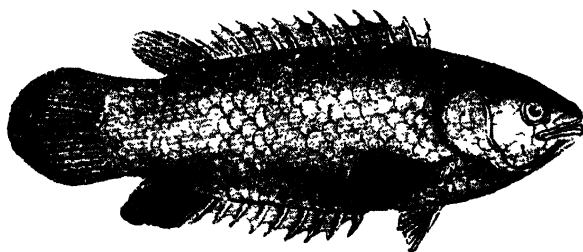
কৈমাছ

পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে উহার কত সাদৃশ্য বুঝিতে পারিবে। সকল মাছের কাঁটা সমান নহে। কোনও কোনও মাছে বড় বেশী কাঁটা, তাহা তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। মাগুর, সিঙ্গী, আড়, বোয়াল, টাঁই, শিলং প্রভৃতি অনেকগুলি মাছের আঁইশ নাই। আবার চিংড়ী, কাঁকড়া প্রভৃতি কতকগুলি মাছের গা খোলা দিয়া ঢাকা। এই সকল মাছে কাঁটা নাই, কিন্তু ইহাদের লম্বা লম্বা শুঁড়, দাঁড়া প্রভৃতি আছে।

মাছের ডিম হইতে মাছ জন্মায়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছের এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ইলিশ, ভাঙ্গন, পার্শ্বে, কৈ, মাগুর প্রভৃতি মাছের পেট ডিমে ভর্ত্তি থাকে। মাছ ডিম পাড়িলে উহা হইতে দুই-তিন দিন পরে বা তাহারও বেশী সময়ে ছোট ছোট মাছ জন্মায়। আমাদের দেশের জেলেরা অনেক সময় নদী হইতে ছোট ছোট পোণামাছ ধরিয়া পুকুরে ছাড়িয়া দেয় কিংবা বিক্রয় করে।

মাগুরমাছ

এই পর্য্যন্ত আমরা সাধারণ মাছের কথাই বলিয়াছি। এখন দুই-চারিটি আশ্চর্য্য রকম মাছের কথা তোমাদিগকে বলিব।

খড়্গা মাছের মাথার লম্বা খড়্গাটি এত ধারাল যে, ঐ মাছ জোরে ধাক্কা দিলে জাহাজ পর্য্যন্ত ফুটা হইয়া যায়। সমুদ্রে অনেক সময় খড়্গা মাছে ও তিমিতে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া যায়। তখন খড়্গা মাছ সুবিধা পাইলেই তিমির পেটে আঘাত করিয়া তাহার পেট চিরিয়া দেয়। এই স্থানে ইহা বলা

যাইতে পারে যে, তিমি একপ্রকার স্তন্যপায়ী বৃহৎ জল-জন্তু। তিমি সন্তান প্রসব করে। উহা এত বড় যে, এক-একটি তিমি মুখ হাঁ করিলে তাহার মধ্যে দশ-পনেরো জন লোক অনায়াসে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে! উহাদের লেজের আঘাত এত

তিমি
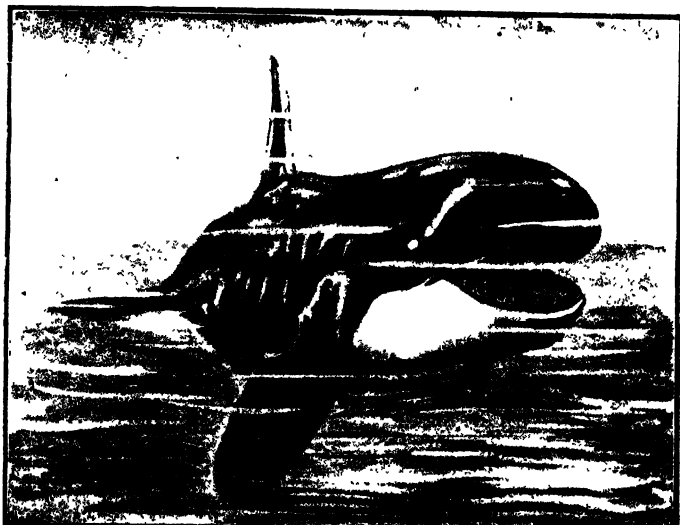
সাঙ্ঘাতিক যে, যে কোনও জীবজন্তু তাহাতে মারা যাইতে পারে। সমুদ্রে থাকে বলিয়া অনেকে তিমিকে মাছ বলেন, বস্তুতঃ উহা মাছ নহে। হাঙ্গর মাছ পেটুক ও অতিশয় হিংস্র; উহাদের দাঁতগুলি অতিশয় তীক্ষ্ণ। আমাদের দেশের নদী-

হাঙর

গুলিতে মধ্যে মধ্যে হাঙ্গরের উৎপাতের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সাহাস মাছ দেখিতে অনেকটা হাঙ্গরের মত। তাহাদের লেজের আঘাতে মানুষের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। অর্জ্জুন নামক এক প্রকার শিকারী মাছ শুঁড় দিয়া পোকা-মাকড় প্রভৃতি ধরিয়া খায়। তারা মাছ দেখিতে তারার মত সুন্দর। তাহারাও শুঁড় দিয়া পোকা-মাকড় ধরে। চুম্বক মাছের এমনি আকর্ষণ-শক্তি যে, উহারা অন্য
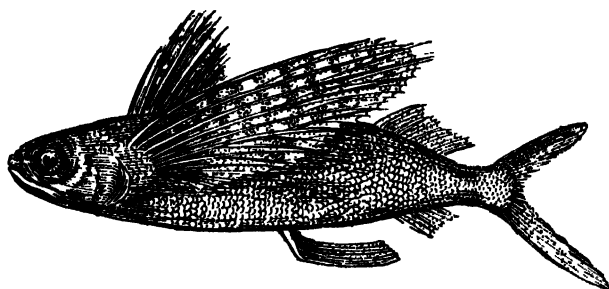
উড়ো মাছ

মাছকে নিকটে টানিয়া আনিয়া ভক্ষণ করে। এইজন্য নাবিকেরা অনেক সময় মাছ ধরিবার জন্য চুম্বক মাছ পোষে। টর্পিডো মাছের দেহ হইতে বৈদ্যুতিক আলো নির্গত হয় এবং উহা দেখিতেও টর্পিডোর (torpedo) মত। উড়ো মাছের পাখ্না বড় বলিয়া উহারা জল হইতে লাফাইয়া কিছুক্ষণ উড়িতে পারে। এক প্রকার গায়ক মাছ দল বাঁধিয়া গান

করে। তাহাদের গান কনসার্ট বা হারমোনিয়ম বাদ্যের মত মধুর।

এই সমস্ত বিচিত্র মৎস্যের কথা আমরা জানিলেও মৎস্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কোন্ মাছ কিরূপে জন্মায়, কত দিনে বাড়ে, কত দিন বা বৎসর বাঁচে, কি খায়, কোথায় থাকিতে ভালবাসে, কখন ও কতক্ষণ ঘুমায় ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক উত্তর আমরা দিতে পারি না। এই সকল বিষয়ে এখনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে। তোমরা একটি জীবন্ত মাছ বোতল বা কোনও পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিয়া কিছুদিন ধরিয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবে। বোতল বা পাত্রের জল মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া দিবে, নতুবা মাছ শীঘ্র মরিয়া যাইবে। কারণ অল্পজলের মধ্যে মাছ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে শীঘ্র ঐজল দূষিত হইয়া মাছের জীবন ধারণের অনুপযোগী হইয়া পড়ে।

বাঙ্গলার জেলে, বাগ্দী প্রভৃতি জাতি মাছ ধরে। ভারতের উপকূলভাগে নুলিয়া, দালাদী প্রভৃতি জাতি সমুদ্রে মাছ ধরে। ঐ সকল জাতি ও নিকারীরা হাটে ও বাজারে মাছ বিক্রয় করে। আজকাল বাঙ্গলার কোনও কোনও স্থানে পশ্চিমা জেলে ও পশ্চিমা নিকারী দেখিতে পাওয়া যায়।

মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত নানা দেশে নানা প্রকার জাল ও যন্ত্রপাতি আছে। তন্মধ্যে জাল, বেড়জাল, খেয়াজাল, চাবি-জাল, পলুই, ছিপ, বঁড়শী, তগী, কুঁচ প্রভৃতি প্রধান। অনেক

প্রকার জাল ও যন্ত্রপাতি আমাদের দেশে প্রস্তুত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার জেলেরা মাছ ধরিবার জন্য আবশ্যকমত জাহাজ, ষ্টীমার, লঞ্চ, নৌকা প্রভৃতি ব্যবহার করে। হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে পাহাড়িয়ারা একপ্রকার বিষাক্ত পাতা
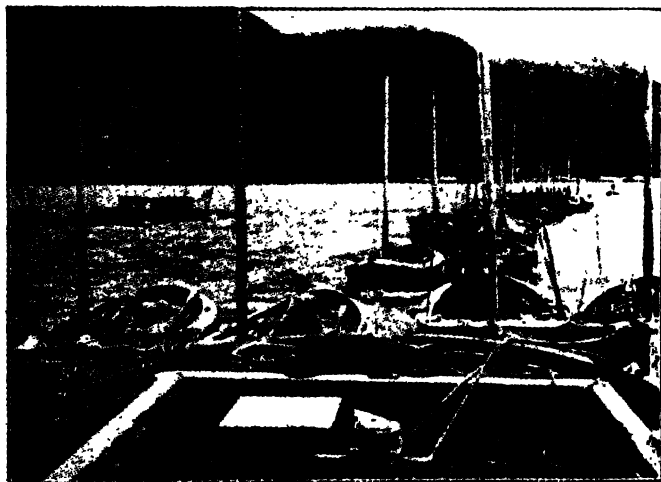
বিলাতের জেলেদের নৌকা

কোনও জলাশয়ে ফেলিয়া দেয়; ফলে—কিছুক্ষণ পরে মাছগুলি মরিয়া ভাসিয়া উঠে। মাছ ধরিবার বহুপ্রকার সরঞ্জাম, রীতি ও কৌশল পৃথিবীতে প্রচলিত আছে।

বাঙ্গালী মাছ খায় মাত্র; কিন্তু মাছের ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর

স্থান অতি নিম্নে। মৎস্য-ব্যবসায়ের কথা মনে হইলে সর্ব্বাগ্রে জাপানের কথা মনে হয়। আমাদেরই মত মাছ-ভাত জাপানীদের প্রিয়খাদ্য। কিন্তু জাপানীরা যে কেবল মাছ খায় তাহা নহে, প্রতি বৎসর মাছের ব্যবসায়ে কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করে। জাপান—চতুর্দ্দিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি মাত্র; কিন্তু প্রতি বৎসর জাপানী জেলেরা তাহাদের দেশের নিকটেই সহস্র সহস্র মণ মাছ ধরে। মৎস্য-ব্যবসায়ে কোন্ জাতির স্থান কিরূপ, নিম্নের চিত্র দেখিলে তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে।

ইউরোপের উত্তরে উত্তরসাগরে এবং আমেরিকার উত্তরে নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ড্ দ্বীপের নিকট প্রচুর কড্, সামন্, প্লেইস্ প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। ঐগুলি গভীর সমুদ্রের মাছ। নরওয়ে, গ্রেটব্রিটেন প্রভৃতি দেশের সমুদ্রের উপকূলে হেরিং, পিলচার্ড, ম্যাকরীল প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। ভূমধ্যসাগরে প্রচুর সার্ডিন মাছ জন্মে। ভারত সমুদ্রে কুলিশ, নিরালক,

নন্দি বারলক, মকর, গর্গরক, চন্দ্রক, মহীমান, রাজীব প্রভৃতি মৎস্য পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে নানাস্থানে শত শত মণ মৎস্য প্রত্যহ ধরা পড়িতেছে। মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্য অনেক দেশে বড় বড় সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। বিলাতের এবার্ডীন, গ্রিমস্‌বী, প্লাইমাউথ

নরওয়ে দেশীয় জেলেদের মৎস্য-শিকার

প্রভৃতি সহরে বহু জেলে বাস করে বলিয়া ঐ সকল স্থানে প্রত্যহ অনেক মৎস্য আমদানী হয়। লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী টেমস্ নদীর তীরে বিলিংস্‌গেট মার্কেট পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ মৎস্যের বাজার।

মাছ শীঘ্র পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং কিরূপে উহা

সংরক্ষণ করিয়া টাট্‌কা অবস্থায় সত্বর দেশ-বিদেশে ক্রেতার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়, মৎস্যের ব্যবসায়ে তাহাই সর্ব্বপ্রধান জানিবার বিষয়। আমাদের দেশে কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় সহরে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা প্রভৃতি নদীর

হেরিং মাছ

তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে বরফের টুক্‌রা দিয়া প্যাক করিয়া প্রায় প্রত্যহ মাছ চালান দেওয়া হয়। কিন্তু এই উপায়ে বহু দূরদেশে—যেখানে যাইতে দশ-পনেরো দিন বা তাহারও বেশী সময় লাগে—তথায় মাছ চালান দেওয়া যায় না। সেই

অসুবিধা দূর করিবার জন্য মাছ, মাংস প্রভৃতি চালান দিবার জাহাজে বা রেলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় ঠাণ্ডা ঘর, রেফ্রিজারেটার (refrigerator) প্রভৃতির বন্দোবস্ত থাকে। ঠাণ্ডা ঘর বা বাক্সে মাছ রাখিয়া দিলে বহুদিন পর্য্যন্ত উহা অবিকৃত অবস্থায় থাকে। ঠাণ্ডা ঘরে মাছ রাখিবার প্রথা কলিকাতাতেও প্রচলিত আছে। কোনও দিন হয়ত বাজারে অনেক বেশী মাছ আমদানী হইয়া হঠাৎ মাছের দাম কমিয়া গেল। তখন বড় বড় মৎস্য-ব্যবসায়ীরা মাছ ঠাণ্ডা ঘরে রাখিয়া দিয়া দুই-চারি দিন পর্য্যন্ত বাজার-দর চড়িবার আশায় থাকেন!

আরও নানা উপায়ে মাছ সংরক্ষণ করা যায়। মাছ পরিষ্কার করিয়া ও তাহার পেট কাটিয়া নাড়ীভুঁড়ি প্রভৃতি বাহির করিয়া ফেলিয়া উহা লবণাক্ত করা হয়। কখনও কখনও মাছ, মাছের ডিম প্রভৃতি উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া কিংবা কিছুক্ষণ ধূমে রাখিয়া দিয়া দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হয়। কতকগুলি মাছ পরিষ্কার করিয়া কিংবা উহা উত্তমরূপে রান্না করিয়া টিনের কৌটায় বাতাসবিহীন অবস্থায় প্যাক করা হয়। এইরূপ মাছ অনেক দিন বেশ ভাল থাকে এবং উহার কাট্‌তি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আছে। কলিকাতার টেরিটি বাজার অঞ্চলে ও বাঙ্গলার আরও অনেক স্থানে শুট্‌কী মাছের গুদাম আছে। সেখানে শুট্‌কী মাছের গন্ধে তিষ্ঠান দায়; কিন্তু যাহারা উহা খায় তাহাদিগের নিকট উহা অতি উপাদেয় পদার্থ।

জেলে ছাড়া আরও বহু লোক মৎস্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। মনে ভাবিয়া দেখ, যে সকল বন্দর হইতে প্রত্যহ শত শত মণ মৎস্য চালান হয় তথায় মাছ পরিষ্কার করা, বরফাচ্ছাদিত করা, লবণাক্ত করা, মাছ চালান দিবার জন্য বাক্স, টিন প্রভৃতি প্রস্তুত করা ইত্যাদি কার্য্যে কত সহস্র লোক নিযুক্ত আছে।

মাছের প্রত্যেক অংশই কোনও না কোনও কাজে লাগে। মাছের আঁইশ হইতে সুন্দর সুন্দর খেলনা, ছবি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কড্ মাছের তৈল ডাক্তারেরা ক্ষয়রোগে ব্যবহার করেন। উহা অতি পুষ্টিকর খাদ্য। কড্ মাছের পেটে যে তৈল পাওয়া যায় উহা গরম জলে সিদ্ধ করিলে এই তৈল জলের উপরে ভাসিতে থাকে। এই তৈল তুলিয়া লইয়া পরিষ্কার করিলে 'কড্লিভার অয়েল' প্রস্তুত হয়। টর্পিডো মাছের তৈল বাতরোগ ও মাথার রোগে উপকারী। আমাদের দেশে ইলিশ, চাঁই প্রভৃতি তৈলাক্ত মাছ হইতে আমরা তৈল নিষ্কাষণ করিতে পারি। কলিকাতায় মৎস্যের তৈলের কারবার আছে, কারণ কলকারখানা প্রভৃতিতে মৎস্যের তৈল ব্যবহৃত হয় এবং বাজারে উহার যথেষ্ট চাহিদা আছে।

সকল দিক বিবেচনা করিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কৃষিকার্য্যের নীচেই বাঙ্গলায় মৎস্যের ব্যবসায়ের স্থান। মৎস্য ধরা কার্য্য অনেক সময় বিপজ্জনক হইলেও—

জেলে, মুলিয়া প্রভৃতি জাতি এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করে বলিয়া অতিশয় সাহসী ও কর্ম্মঠ হয়। জাতি গঠনে এই সকল লোকের উপকারিতা কত বেশী, তাহা ইংলণ্ড, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্, জাপান ও অন্যান্য জাতির ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইয়াছে। ইংরাজ এখন নৌ-বাণিজ্যে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান জাতি। তাহার কারণ এই যে, গ্রেটব্রিটেনের বহু লোক জেলের কার্য্যে দক্ষ হইয়া সুদক্ষ নাবিক হইয়াছে। জেলে, মুলিয়া প্রভৃতি কতকগুলি জাতি পুরুষানুক্রমে এই ব্যবসায় করে বলিয়া উত্তাল তরঙ্গমালা, ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি দেখিয়া আদৌ ভীত হয় না; বরং সেই সকল প্রাকৃতিক শক্তির সহিত যুদ্ধ করাই তাহারা জীবনের ব্রত ও আনন্দদায়ক কার্য্য বলিয়া মনে করে। মৎস্যের ব্যবসায়ে ঘৃণা করিবার কিছুই নাই, বরং গৌরবের বিষয় যথেষ্ট আছে।

নানা কারণে আমাদের দেশের উৎপন্ন মৎস্যের পরিমাণ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর এই প্রিয় খাদ্য দিন দিন মহার্ঘ হইয়া পড়িতেছে। জলাশয়গুলি বুজিয়া গিয়া কচুরীপানা, আবর্জ্জনা প্রভৃতিতে পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় মৎস্য পালনের অসুবিধা ঘটিতেছে। আমরা যদি আরও কিছু দিন এই দিকে লক্ষ্য না করি, তাহা হইলে কয়েক বৎসর পরে আমাদিগকেও জাপান ও অন্যান্য জাতির উপর মৎস্যের জন্য নির্ভর

করিতে হইবে। তাহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থার কথা কল্পনাও করা যাইতে পারে না। বাঙ্গলার শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বড় হইয়া কেহ কেহ এই ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে কি ?